কবিতাসংগ্রহ

শঙ্খ ঘোষ

কবিতাসংগ্রহ

শঙ্খ ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৭
প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম : ২০·০০

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩
মুদ্রাকর : সনাতন হাজরা, প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা ৭০০০০৬

কবিতাসংগ্রহ

সূচিপত্র

দিনগুলি রাতগুলি (রচনা ১৯৪৯-৫৪/প্রকাশ ১৯৫৬)

দিনগুলি রাতগুলি

দিনগুলি রাতগুলি ২১
অবগুণ্ঠিতা ২৫
আকাঙ্ক্ষার ঝড় ২৬
হিমানী ২৭
পিলসুজ ২৮
হোম করে নাও ২৯
উজ্জীবন ৩১
বাউল ৩২
স্তব্ধ সুদূর প্রান্ত ৩৩
পলাতকা ৩৪

যমুনাবতী

কবর ৩৬
পৃথিবীর জন্য ৩৭
শিশুসূর্য ৩৮
ঘরেবাইরে ৪০
সপ্তর্ষি ৪২
একটি দুর্গের কাহিনী ৪৩
সেই তাকে ৪৭
খণ্ডিতা ৪৭
জ্যৈষ্ঠ '৬০ ৪৮
স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে ৪৯
বলো তারে 'শান্তি শান্তি' ৫০
যমুনাবতী ৫২

ধানে গানে বসুধায়

সূর্যমুখী	৫৪
অন্তরাত	৫৪
এই প্রকৃতি	৫৫
পথ	৫৬
বনমায়া	৫৭
ধানে গানে বসুধায়	৫৮
সকাল দুপুর সন্ধ্যা	৫৯
মেঘে-মেঘে	৬০
ভাষা	৬১
কলহংপর	৬১
আড়ালে	৬২

নিহিত পাতালছায়া (রচনা ১৯৬০–৬৬/প্রকাশ ১৯৬৭)

বিপুলা পৃথিবী

বিপুলা পৃথিবী	৬৭
সত্তা	৬৮
মাতাল	৬৮
অস্তিম	৬৯
পাগল	৬৯
বুড়িরা জটলা করে	৭০
পোকা	৭১
প্রতিশ্রুতি	৭১
কিউ	৭২
আয়না	৭৩
মুহূর্তের মুখ	৭৩
ডানার শব্দ	৭৫
বাস্তু	৭৫
ভিড়	৭৬
রাস্তা	৭৬

শাদা দেয়াল ৭৭
অলস জল ৭৮
ফুলবাজার ৭৮
বৈধাবৈধ ৭৯
চাবুক ৮০
পিঁপড়ে ৮০
সজ্ঞ ৮১
ঘর
ঘর ৮২
যে-ঘর ছেড়ে ৮২
পরাভব ৮৩
জল ৮৪
ইট ৮৪
বাড়ি ৮৪
ঘর : ১ ৮৫
ঘর : ২ ৮৫
আধখানা মুখ ৮৬
মধ্যরাত ৮৭
খাল ৮৭
বৃষ্টি ৮৮
মুনিয়া ৮৮
দুপুরের পাখি ৮৯
যেন কোনোদিন ৮৯
ঘেরা-জাল ৯০
আলাপচারি ৯০
রাঙামামিমার গৃহত্যাগ ৯১
মধ্যদুপুর ৯১
আমাদের ভালোবাসা ৯২
হাজারদুয়ারি ৯৩
যাব না সাগরে ৯৩

ছুটি ৯৪
এখন সময় নঃ
এখন সময় নয় ৯৫
সময় ৯৬
ভিক্ষা ৯৬
নাম ৯৬
এম্‌নি ভাষা ৯৭
সহজ ৯৭
ঘুম ৯৭
প্রতীক্ষা ৯৮
প্রতিহিংসা ৯৯
গুল্ম, ঈথার ৯৯
আবাল ১০০
নিজের আয়না ১০০
দ্বা সুপর্ণা ১০১
চরিত্র ১০১
এ খেলার আরেক নিয়ম ১০২
যখন প্রহর শান্ত ১০৩
চাবি ১০৩
আড়াল ১০৩
যাবার মতো নই ১০৪
দেহ ১০৫
জন্মদিন ১০৫
নষ্ট ১০৬
উদাসীনা ১০৬
সুন্দর ১০৭

তুমি তো তেমন গৌরী নও (রচনা ১৯৬৭-৬৯/প্রকাশ ১৯৭৮)

এই নদী, একা	১১৩
কখনো-বা মনে	১১৩
শুশুনিয়া	১১৪
মিথ্যে	১১৫
ঘণ্টাঘর	১১৫
অশুচি	১১৬
আমার সমান	১১৭
সল্ট লেক	১১৭
শ্মশানবন্ধু	১১৮
ভ্রমণ	১১৮
দুই হাতে দুই প্রান্ত	১১৯
সময়হরণ	১১৯
ভিখারি বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও	১২০
খরা	১২১
নিঃশব্দ	১২১
অপমান	১২২
দশমী	১২৩
পুনর্বাসন	১২৪
ভূমধ্যসাগর	১২৫

জলস্রোত

খোলা মাঠ	১২৮
কাঞ্চনজঙ্ঘা	১২৮
ভয়	১২৯
আদমের জন্ম নয়	১২৯
খুকু	১৩০
ঋণ	১৩০
আরুণি উদ্দালক	১৩১
জাবাল সত্যকাম	১৩৫

আদিম লতাগুল্মময় (রচনা ১৯৭০-৭১/প্রকাশ ১৯৭২)

পাথর

পাথর	১৪৩
আনন্দ	১৪৩
অবিমৃষ্ট বালি	১৪৪
সনাতন	১৪৪
বিষ	১৪৫
ব্যভিচার	১৪৬
অন্তরাল	১৪৬
প্রপাত	১৪৭
বিদায়	১৪৮
পুতুলনাচ	১৪৮

দল

দল	১৫০
ইঁদুর	১৫০
রাজনীতি	১৫১
ক্রমাগত	১৫২
বিকেলবেলা	১৫২
যাদব	১৫৩
আদর	১৫৪
যুক্তি	১৫৪
শ্লোগান	১৫৫
মহিষ	১৫৫
নিগ্রো বন্ধুকে চিঠি	১৫৬
শীতে একটি নিগ্রো মেয়ে	১৫৭
সত্যি বলার মানে	১৫৭
কলকাতা	১৫৮
বোকা	১৫৯
ছাতা	১৬০

কল্পনা ১৬০
ব্যাঙ ১৬১
মানুষ ১৬২
দুই বাংলা ১৬২
একা ১৬৩
দেশহীন ১৬৩
বিবেক ১৬৪
সত্য ১৬৪
চিতা
চিতা ১৬৫
যখন লোকে ১৬৫
বিরলতা ১৬৬
বৃষ্টিধারা ১৬৭
মূল ভাষা ১৬৭
কবিতার প্রসাধন ১৬৮
কথা ১৬৮
ধর্ম ১৬৯
যৌবন ১৬৯
ত্যাগ ১৬৯
প্রেমিক ১৭০
এতক্ষণ ১৭০
ঠাকুরদার মঠ ১৭১
শরীর ১৭১
অঞ্জলি ১৭২
রেড রোড ১৭২

মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় (রচনা ১৯৭২-৭৩/প্রকাশ ১৯৭৪)
নির্বাসন
নির্বাসন ১৭৯
শরীর ১৮০

খরা ১৮০
পতঙ্গ ১৮১
না ১৮১
আউট ১৮২
এপিটাফ ১৮৩
আঙুল ১৮৩
বর্ম ১৮৪
কুঠায় ১৮৪
স্পর্ধা ১৮৫
ছায়া ১৮৫
পুনর্মিলন ১৮৬
সন্ততি ১৮৬
চালচলন
প্রতিভা ১৮৭
জয়োৎসব, ১৯৭২ ১৮৮
স্বৈরিণী ১৮৯
এ-বসন্তে ১৯০
শাদাকালো ১৯০
ইণ্টারভিউ ১৯১
গ্রাম থেকে একজন ১৯২
চালচলন ১৯২
হাসপাতাল ১৯৩
পায়ের নিচে একটুকরো খাবার ১৯৭
সমাজসেবক ১৯৫
বাবুমশাই ১৯৬
পাগল হবার আগে ১৯৮
এদিক-ওদিক ১৯৮
এই শহরের রাখাল ১৯৯
শব্দের প্রকৃত বোধ ২০০
ঘরে ফেরার রাত ২০০

রূপ ২০১
তিমির বিষয়ে দু'টুকরো ২০২
বড়ো বেশি দেখা হলো ২০২
সঙ্গিনী
তুমি ২০৩
পালা ২০৩
গঙ্গাযমুনা ২০৩
মীমাংসা ২০৪
মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় ২০৫
বৃষ্টি ২০৫
অন্ধকার ২০৬
সন্ন্যাসী হয়েছে হাওয়া ২০৬
আয়ু ২০৭
মুখোশমালা ২০৭
হওয়া ২০৮
বাজি ২০৮
কয়েকটি টুকরো ২০৯
বই ২১০
কুয়াশা ২১১
ধর্ম ২১১
সঙ্গিনী ২১১
মানে ২১২

বাবরের প্রার্থনা (রচনা ১৯৭৪-৭৬/প্রকাশ ১৯৭৬)
মণিকর্ণিকা
ধ্বংস করো ধ্বজা ২১৩
পুরোনো গাছের গুঁড়ি ২১৪
সেদিন অনন্ত মধ্যরাত ২১৪
ভানা এখন চুপ ২১৯
পথের বাঁকে ২২০

শাদা ফলক ২২১
মণিকর্ণিকা ২২১
জীবনবন্দী ২২২
তক্ষক ২২৩
মহানিমগাছ ২২৪
এইসব কথা বলাবলি ২২৫
একদিন সিঁড়ি বেয়ে ২২৫
কেউ কারো মতো নয় ২২৬
একদিন আমরাও ২২৭
বাবরের প্রার্থনা ২২৭

খড়

শূন্যের ভিতরে ঢেউ ২২৯
মোরগঝুঁটি ২৩০
খড় ২৩০
দাগ ২৩১
মিলন ২৩১
এইরকম ২৩২
দু'একটি ছবি ২৩২
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড ২৩৩
শুশ্রূষা ২৩৩
মিলের জন্য ব্যক্তিগত ২৩৪
ঢাকা ১৯৭৫ ২৩৫
দুই মুহূর্ত ২৩৫
বেজে উঠল ঢাক ২৩৬
মনকে বলো 'না' ২৩৭

হাতেঃতাই

ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ ২৩৮
কিছু-না থেকে কিছু ছেলে ২৩৮
হাসপাতালে বলির বাজনা ২৩৯
শান্তি ২৪০

ভিখিরি ছেলের অভিমান ২৪০
কালযমুনা ২৪১
পাখি বিষয়ে দুটি ২৪২
চাপ সৃষ্টি করুন ২৪৩
'মার্চিং সং' ২৪৩
রাধাচূড়া ২৪৪
মহাজন ২৪৫
'আপাতত শান্তিকল্যাণ' ২৪৬
শৃঙ্খলা ২৪৭
বাবু বলেন ২৪৮
বিকল্প ২৪৯
হাত্রেমভাই ২৫০
মনোহরপুকুর ২৫১
নচিকেতা ২৫২

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ (রচনা ১৯৭৬-৮০/প্রকাশ ১৯৮০)
১-৬৪ ২৫৭-২৯২

দিনগুলি রাতগুলি

ইভাকে

দিনগুলি রাতগুলি

[ইভাকে]

৭ জানুয়ারি । রাত্রি

হে আমার সুনিবিড় তমস্বিনী ঘনভার রাত্রি, আমাকে হানো।
ঐ তার আলুলায়িত বেদনার কালো, তারই চুপে দীর্ঘকাল এ আমার স্নান,
বদ্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা—
কী লাভ কী লাভ তাকে অবিশ্রাম ক্লীবত্বের জ্বালাময় দৈন্যে পুঞ্জ ক'রে ?
কিংবা তাকে মহত্ত্বের শিখরে ছুটিয়ে নিয়ে অবশেষে নির্বাধ প্রপাতে
অন্তহীন অন্তহীন অন্ধকারে বিসর্জন ক'রে
কী লাভ কী লাভ ?

তাই
এমন আকাশ হবে তোমার চোখের মতো ভাষাহীন নির্বাক পাথর, দৃষ্টি তার স্থির হবে মৃতের প্রাণের মতো উদাসীন নির্মম শীতল, তুমি আছো সর্বময় রাত্রির গহনে মিশে – আমি এক ক্লান্তির কফিনে, তুমি যদি মৃত্যু আনো অবসাদে মূক আর কঠিন কুটিল রাত্রি জুড়ে—
হে আমার তমস্বিনী মর্মরিত রাত্রিময় মালা,
মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে হে আমার উদাসীন মালা,
আমার জীবন তুমি জর্জরিত করো এই দিনে রাত্রে দুপুরে বিকেলে
এবং আমাকে বলো, 'মাটির প্রবল বুকে মিশে যাও তৃণের মতন' :
আমি হব তাই
তৃণময় শান্তি হব আমি ॥

৮ জানুয়ারি । সকাল

ধীরে, আরো ধীরে সূর্য। উঠো না উঠো না। আবার প্রভাত হলে

পৃথিবী উন্মুখ হবে, রৌদ্র হবে ব্যাধের মতন। আমাকে হানবে তারা বড়ো!
তার চেয়ে তমস্বিনী রাত্রি ভালো আজ, তামসীরে মেরো না মেরো না—
ধীরে, আরো ধীরে সূর্য। উঠো না উঠো না।

৮ জানুয়ারি। দুপুর

হাহাতপ্ত আলাবাষ্প দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।
আকাশ, প্রসন্ন হও। রৌদ্রহর মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝাকালো করো দিগঞ্চল দীর্ঘ করো তামসগুণ্ঠন। আমাকে আবৃত করো ছায়াবৃত একখানি ধূসর-বাতাস-ঢালা অকরুণ আলোর মালায়,
আমাকে গোপন করো তুমি।

৮ জানুয়ারি। রাত্রি

আকাঙ্ক্ষা উন্মত্ত হয়, প্রেমের বিষাণে তারা ছুটে ছুটে মাথা কুটে মরে, ভয়ে কাঁপে দূর-দূরান্তর।
কত বলি, কত ভালোবেসে মৃদু স্বরে-স্বরে বলি তাকে, রে দুরন্ত চোখ, স্পর্শ তাকে কোরো না কোরো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে অন্তহীন সে পেয়েছে শুধু একখানি
অবসন্ন দীন ছায়ামাখা ভারি কৃপণ আকাশ
সেই তার ভালো।
কত বলি, শোনো তুমি অবকাশহারা গূঢ় ব্যথায় আরক্ত-চিত্ত, শোনো। লজ্জার আনীল বিষে মুখ তুমি ঢেকো না ঢেকো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে অবিরাম সে এনেছে একখানি শুধু
যন্ত্রণার ডালা।
সেই তার ভালো।

৯ জানুয়ারি। সকাল

'এখানে ঘুমায় এক মানবহৃদয়, তার জলে লেখা নাম।'
কবিদেব, কেবল বেদনা—আহা কেবল বেদনা বুঝি ভালোবাসে তোমার হৃদয়!

মাটির শীতল স্পর্শে অবিরাম অবিরাম কবর কামনা করো তাই? কতদিন মুঠো মুঠো এমন প্রভাত তুমি ধরেছ কিশোর? কতদিন সূর্য থেকে মাটি থেকে শূন্য থেকে ধরেছ আকুল মনোভারে
একখানি শিথিল প্রণয়?
অবশেষে একদিন জলে-লেখা-নাম কবি মাটির বাসরে ঘুম রচে।

কবি তুমি যেয়ো না যেয়ো না।
বেদনার শাদা ফুলে আকাশ নিবিড় হবে, অবকাশে ভরে যাবে প্রাণ। অবশ বিরামভরা এ পদচারণা তার পুঞ্জ হবে ভাষার আলোকে। আকুঞ্চিত দুটি হাতে আঙুলে আঙুলে তুমি টেনে নেবে গান—
অবশেষে থরে থরে কথার কাকলি তুলে বীথিকুঞ্জ সাজাবে প্রণয়ী, উচ্চকিত পৃথিবীর দুর্বার প্রতাপ তুচ্ছ ক'রে, কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-আশ্লেষ-ধন্য মেঘকুঞ্জ কথার প্রণয়ী
রাত্রির আবেশে মগ্ন হবে—
তবু সে প্রেমের রাত্রি তার!

কবি তুমি যেয়ো না যেয়ো না।

১১ জানুয়ারি। দুপুর
সুন্দর কবিতা সখী!
যখন বিষণ্ণ তাপে প্রধূম গোধূলি তার করুণাবসন ফেলে সূর্যমুখী পৃথিবীকে ঢাকে, কঠিন বিলাপে কাঁপে উপশিরা-শিরা, জ্যোতিষ্কলোকের রূপসীরা একে একে ছিন্ন করে দয়িত-আকাশ, যখন প্রেমের সত্য ভুবনে ভুবনে ফেরে করুণ লেখায়, তুমিও আসন্ন চন্দ্রে মেলে দাও হৃদয় তোমার, আমি থরোথরো শীতে যন্ত্রণার শিখা মেলি আতপ-তির্যক, যখন পৃথিবী কাঁপে মৃততেজা মুঠোতে আমার—

তখন কবিতা মিতা, প্রিয় থেকে প্রিয় সখী, সুহৃদ, সুন্দর।

জলের ডালায় যদি হৃদয় প্রসার করি, তোমারই বিকাশ।
মেঘের গুহায় ঢালি হৃদয় যখন, দেখি তোমারই বিকাশ।
কুয়াশা-উথাল জটা দিক দিক ভরে যদি তোমারই বিকাশ।
স্মরণ যেখানে, প্রাণ যেখানেই, সেখানেই তোমার বিকাশ।

তখন কবিতা মিতা প্রিয় থেকে প্রিয় সখী সুহৃদ সুন্দর!

কবি রে, তোর শূন্য হাতে
আকাশ হবে পূর্ণ—
উদাস পাগল গভীর সুরে
ডাক দে তারে ডাক দে!
ভাঙতে কাঁকন, ছিঁড়তে বাঁধন
কুলোয় না তার সাধ্যে
কবি রে, আজ প্রেমের মালায়
ঢেকে নে তোর দৈন্য!

বহো রে	আলোর মালা	অবশা	রাত্রি ঘিরে
মেঘের ওই	আকাশ ছিঁড়ে	ঝরে রে	বেদন-সুরা
কবিতা	কল্পলতা	আকুলা	চঞ্চলতা
বাঁধে রে	যন্ত্রণা তার	বাঁধে সে	তমস্বিনী॥
বহো রে	আলোর মালা	গগনে	দাও ছড়িয়ে
দহনে	দগ্ধ ক'রে	হৃদয়ে	ঝিলিক করো—
মেঘে কে	জাগছ তুমি	জাগো কে	শূন্যপুরে?
কবিতা	স্বর্ণলতা	হৃদয়ে	চক্ষে জ্বলে॥
বহো রে	আলোর মালা	তামসী	কণ্ঠ জুড়ে—
তবু কে	কাঁদছে সুরে?	কবি কি	নিত্য কাঁদে?
কবি, সে	নিত্য কাঁদে	আকাশে	নিত্য বেদন:
বহো রে	আলোর মালা	ছেঁড়ো রে	কালোর বাঁধন॥

১২ জানুয়ারি। রাত্রি

বাসনা-বিদ্যুতে তুমি ছিন্ন করো চরিত্রের মেঘ। প্রভূত-আবেগ-পুঞ্জ চেতনার

বৃষ্টি করো আলুথালু প্রকৃতির মুখে। রজনী শাওন-ঘন, জীবন মন্থর, দুঃখ কাঁপে দুর্বল দারুণ।
প্রেমের বিকীর্ণ শাখা ফুলে-ফলে জলে। জেগে ওঠে ধীরেধীরে একখানি তপ্তহত পরিপূর্ণ মুখ। রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।

অবগুণ্ঠিতা

রাত্রির জীবন আমি নৈঃশব্দ্যের নিভৃত কান্নায়
ভরে দিই। রাত্রি তুলে ধরে তার দ্বিপ্রহর মুখ—
সে মুখে বিষণ্ণ ব্যথা বলিরেখা আঁকে অহরহ।
আমারই চেতনা তার উচ্চকিত প্রচণ্ড বন্যায়
ভেঙে যায়, রাত্রি বলে চুপি চুপি, ঝরুক ঝরুক,
তোমার হৃদয় ঝরে পড়ে যাক মৃত্যুর অসহ
নগ্ন বুকে। রাত্রির ললিত দেহ ভরে দি কান্নায়।

পৃথিবী তোমাকে আমি দেখিনি, দেখি না কতদিন!

হে নিবিড় রাত্রি, তুমি কী লাবণ্য ছড়িয়েছ চুলে
মৃদু মৃদু মায়া ঢেলে, চিবুক নেমেছে ক্লান্ত হাতে
ধীরে ধীরে, আর তুমি অন্যমনে বিশীর্ণ আঙুলে
জড়িয়েছ অবসন্ন জ্যোৎস্নার আঁচল। নিত্য তাতে
দুফোঁটা করুণ মেঘ বৃষ্টি হতে চায় বার বার,
অশ্রু হতে চায়, আর তুমি প্রিয় নিঃসীমতা তুলে
গুণ্ঠন ঢেলেছ মুখে। বসে আছো প্রতীক্ষায় তার।

পৃথিবী তোমাকে আমি দেখিনি, দেখি না কতকাল!

আকাঙ্ক্ষার ঝড়

এপার-ওপার-করা নিঃঝুম নির্জনতায়
অন্ধকার সন্ধ্যার অজস্র নিঃসঙ্গ হাওয়ায়
তুমি তুলে ধরো তোমার
মেঘের মতো ঠাণ্ডা, চাঁদের মতো বিবর্ণ
শাদা পাণ্ডুর মুখ
প্রকাণ্ড আকাশের দিকে।

দূর দেশ থেকে আমি কেঁপে উঠছি
আকাঙ্ক্ষার অসহ্য আক্ষেপে—
তোমার মুখের শাদা পাথর ঘিরে কাঁপছে
আর্তনাদের প্রার্থনার অজস্র আঙুলের মতো ক্ষীণ গুচ্ছ চূর্ণ কেশদাম
অন্ধকার হাওয়ায়।

মেঘে মেঘে আকাশের ভারি কোণ পুঞ্জ হয়ে ওঠে,—
তারই মধ্যে ইচ্ছের বিদ্যুৎ ঝিলকিয়ে যায় তীব্র জোরে বারংবার
প্রচণ্ড আবেগে ফেটে-পড়তে-চাওয়া ভালোবাসার দুরন্ত ঢেউ
অস্থির করে তোলে অন্ধকারের নিঃসীম ব্যবধান
মগ্ন স্থির মাটির ঘন কান্তি।
তুমি তুলে ধরো তোমার
মেঘের মতো ঠাণ্ডা, চাঁদের মতো বিবর্ণ মুখ
কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত-চুপ মাটির ঢেউয়ের মতো স্তন
প্রার্থনায় অবসন্ন ব্যাকুল বিশীর্ণ দীর্ঘ প্রত্যাশার হাত
সেই বিক্ষুব্ধ প্রকাণ্ড আকাশের দিকে—
আর তাই ঘিরে অন্ধকার, গুঁড়ি গুঁড়ি চুল,
নিঃসীম নিঃসঙ্গ হাওয়ায় অজস্র স্বরের বাজনা।

ক্রমশ প্রস্তুত সৃষ্টি, যেন
ভীষণ মধুর লগ্নে দুঃসহ বজ্র হয়ে ভেঙে পড়ে তার আকাঙ্ক্ষার মেঘ

তোমার উদ্ধত উৎসুক প্রসারিত বিদার্ণ বুকের মাঝখানে
মিলনের সম্পূর্ণ মায়ায়—

তার পর, ভিজে এলোমেলো ভাঙা পৃথিবীর আবর্জনা সরিয়ে
সুন্দর, ঠাণ্ডা, মমতাময়ী সকাল।

হিমানী

আমার হিমগৃহ হিমের কুন্তল ছড়িয়ে চুপচাপ
বলবে ইতিহাস, আমার ভয় সেই বেদনাকেই।
শীতের বলিমুখ অন্ধ এ বাতাস। জীবন অভিশাপ :
প্রেমের অবসানে আমার ভয় সেই বেদনাকেই।

তুমি তো বিস্তার করেও যেতে পারো প্রদীপ টিমটিম
প্রেমের ছায়া-হরা বছর কেটে যায় উদার নিঃসীম।
তুমি তো বিস্তার করেও যেতে পারো তোমার সিঁথিমূলে
অরুণ আশাটিকে নতুন লালে লালে ভরেও এলে পারো—
শিখাকে আরো আরো জ্বালিয়ে দিলে পারো সলতে তুলে তুলে :
আমার ইতিহাস গুহায় বসে বসে দুহাতে মালা বোনে।

আমার হিমগৃহ হিমের কুন্তল ছড়িয়ে নিঃঝুম
চোখের ঢালু কোলে শীর্ণ জলরেখা চিবুকে নেমে আসে—
যে-ব্যথা ঢেকে রাখো গোপনে, মাথা পেতে সে বুকে নিঃঝুম
তোমার কালো নদী চিবুকে ক্ষত ঢেলে সে-বুকে নেমে আসে !

সুদূর হিমগৃহ, আমার আমরণ তোমাকে ঢেকে থাক।

পিঙ্গসবুজ

সান্ধ্য-শহর এ কোন্ প্রান্তে নির্জন নীড় বাঁধে কৌশলে !
ঢেলেছি আমার মুখখানি তার দুঃখের কুন্তলে পলে পলে
হায় রে তিমির অন্ধ !
অন্ধ তিমির এ কী বিচিত্র কোরকে কোরকে ঢেকেছে সবুজ—
এলোমেলো দূর একখানি কালো আকাশের মালা ঢালা ঘাসে ঘাসে
হায় রে তিমির অন্ধ !

থরে থরে ঘন নিবিড় গহন কুন্তলে ঢেকে ক্লান্তিমোহন
লাবণ্যভাঙা মুখ—
তুমি প্রেয়সীর মতো ব্যথা তুলে তর্জনী তুলে শাসন তুলেছ—
সান্ত্বনা নয় সান্ত্বনা নয়, শুধু কৌতুক-
পালা !

স্তব্ধ রজনী জেনে জেনে যায় নিদ্রাবিহীন জ্বালা !!

তবু গর্বিতা অন্ধ বন্ধ তামসে হৃদয় ডাকে
প্রলয়ভঙ্গে টেনে এতদূর 'থামো' সে বলেছে কাকে ?
তিমিরের ফেনা ভেঙেছে দুধারে বিচলিত বাঁকে বাঁকে—
চঞ্চল চলা থামে না, প্রেমের আঁচলে তন্দ্রা ঢাকে ॥

ইতস্তত একটি-দুটি গাছ
ভেঙেছে বুক তিমিরসন্ধ্যার
যন্ত্রণায় ঘন গভীর চোখ
পাতায় পাতায়, একটি-দুটি গাছ ।

সারা শহর দিনের বাজ ফেলে
কাঁপছে রণরঙ্গে থই থই
এখানে তার প্রাণের মতো সখা
তিমির-ছেঁড়া একটি-দুটি গাছ !

আমার মাটি যন্ত্রণায় কাঁপে
শিকড়ে তারই অন্ধ আক্ষেপ
তুলেছে বুকে যন্ত্রণার ধারা
পাতা পাতায়, একটি-দুটি গাছ !

পুঞ্জধার কুয়াশা ঘন স্রোতে
শাদা নদীর প্রপাত-মতো নামে
প্রেমেরই মুখে চলেছি অবিরত—
আমার পাশে একটি-দুটি গাছ !

একটি গাছ পিলসুজ ছড়িয়ে পড়ে তাতে
হঠাৎ জাগা জ্যোৎস্নার শিখার কণিকা কি ?
দুঃখ নেই কার কার ? এসো না এই পথে—
একটি ছোটো গোল কুঁজ মাটিতে মুখ রাখি !
একটি গাছ পিলসুজ চাঁদের শিখা তাতে।

হোম করে নাও

রহস্যবুক শর্বরী, তুমি অন্ধকারের তৃষ্ণাতুষার
আনছ, গভীর কণ্ঠে বলছ 'সমুদ্রে ঝাঁপ দিস্ না'—সাগরে
তবু ঝাঁপ দিতে হলো।

তবু ঝাঁপ দিতে হলো হলো এই কলকল্লোল
জলে এলোমেলো প্রাণের সকল সজল কুসুম
ফেলতেই হলো, ঝড়-জল-জলে
গর্জন ক'রে
নামতেই হলো পথে পথে, আর শর্বরী তুমি এমন হাসিতে
হাসছ কেমন ক'রে—

গভীর গভীর ছবির স্বপ্নে হাসছ কেমন ক'রে ?

অতীত-মধ্য কালের লোধ্রলোচন তোমার
লিপিবিহ্বল চোখে চোখে ঢালে কোন্ লালসার
মল্ল আষাঢ় !
ঝিপি ঝিপি পড়ে প্রত্যাখ্যান স্বপনীবীর
কোন্ লালসার আষাঢ়ে আকাশ
ঝিপি ঝিপি ভাঙে মত্তধারায় !

সেই আকাশের এককোণে তার মেঘ খুলে দেখি
তোমার চোখ
অজস্র তার তিমির তিমির হাতে নিয়ে দেখি
চোখের জল
বর্ষণসারা মাটিতে মাটিতে তোমারই ঠোঁটের
গভীর দাগ
দুরান্ত দূর আকাশে তোমার
মণি-নিষ্প্রভ চোখ দেখে দেখে চিৎকার ক'রে কী ব্যাকুল হাতে
চোখ ঢাকবার মন ঢাকবার যেই আয়োজন — অমনি তোমায়
বিদ্যুদ্বর কঙ্কণকণ বেদনাবন্ধ ঝাপটাল ঝাঁপি !
রন্ধ্ররন্ধ্র বেদনাবন্ধ
ঝাপটাল, তুমি চক্ষু ঢেকো না চক্ষু ঢেকো না — সসাগরা ধরা
সেই আকাশের এককোণে আর মাটিতে মাটিতে তিমিরে তিমিরে
অশ্রুমতীর দুঃখবতীর ব্যথাবেদনার দুঃখরতির
তিমিরে তিমিরে ভরসা কাঁপায় -
ভয় নেই আর ভয় নেই তুমি আমাকেই পারো যজ্ঞে ঢালতে
আমাকেই তুমি হোম দিতে পারো
ভয় নেই ।

শহরোপান্তে চাপা সন্ধ্যার চুপ নেমে আসে চুপচাপ ক'রে
আমি পথে আছি নিথর, আমার মন হেঁটে যায় চুপচাপ ক'রে

সেই কালো দূর দূর্বার বুকে ঠোঁট চেপে চেপে চুপচাপ ক'রে
কান্না কান্না কী কান্না আর বিষাদকে তার ভিজোল, আমায়
উচ্চ-চকিত শবরোল্লাসে দুরন্ত বিষতীর বিঁধে বিঁধে
নিয়ে যাও এই ঘর থেকে আর হোম করে নাও আমাকে তোমার
ছলনাবালার আশ্লেষশেষ ক্ষীণ-অবশেষ আমাকে তোমার
হোম করে নাও— দুরন্ত-ঝড়-কল্লোল তুলে আমাকে তোমার
হোম করে নাও হোম করে নাও !

অতীতমধ্য কালের লোধ্রলোচন তোমার
লিপিবিহ্বল চোখে চোখে ঢালে সেই লালসার
মল্ল-আষাঢ়, শর্বরী তুমি এমন হাসিতে
হাসছ কেমন ক'রে !
গভীর গভীর ছবির স্বপ্নে হাসছ কেমন
ক'রে !

উজ্জীবন

আমাকে সেই কবিতালোকে উদ্ভাসিত করো।
লাবণি-হিম মুখের ছায়া করেছ বিস্তৃত
হৃদয়ে, দিকে-দিগন্তরে। কে কাঁপে থরোথরো
হিমবতীর ছোঁয়ায় হিম ? আলোয় উপনীত
ফুলের চূড়া, কবিতালোক উন্মথিত করো।

তুচ্ছ নীল বেদনা যদি ঘনিয়ে ওঠে বুকে
বেদনাবতী— ধুলোতে তারা লুটোবে, তারও আগে
আমার প্রতি-রক্তকণা কবিতা করো করো।
ছিন্ন করো আমাকে তুমি, ব্যাপ্ত কৌতুকে
মথিত করো দীর্ণ করো প্রবলঝড়-রাগে

আমাকে দৃঢ় রুদ্ররেখা কবিতা করো করো
অশনি হানো জয়ন্তী ক্লীব ক্লিন্ন চোখেমুখে ।

রাত্রি তুমি আমাকে আর কোরো না বারে বারে
পুঞ্জশব গলিতমুখ । যৌবনের তেজে
প্রেয়সী তুমি রক্তে তার উন্মাদনা ভরো ।
এই যে নীল অন্ধকার, এই যে সারে সারে
সূর্যরেখা, এই যে মেঘ, এই যে ধূলি—সে যে
আমারই মুখ—আমায় ভেঙে কবিতা করো করো,
রাত্রি তুমি বাঁধো আমায় যৌবনের ভারে

আমাকে সেই কবিতালোকে উজ্জীবিত করো ।

বাউল

বলেছিলাম, তোমায় নিয়ে যাব অন্য দূরের দেশে
সেই কথাটা ভাবি,
জীবনের ওই সাতটা মায়া দূরে দূরে দৌড়ে বেড়ায়
সেই কথাটা ভাবি ।
তাকিয়ে থাকে পৃথিবীটা, তোমার কাছে হার মেনে সে
বাঁচবে কেমন ক'রে !
যেখানে যাও অতৃপ্তি আর তৃপ্তি দুটো জোড়ায় জোড়ায়
সদরে-অন্দরে ।

উদাসিনী নও কিছুতে—বুঝতে পারি তোমায় বুকে
অন্য কিছু আছে,
যন্ত্রণা তার পাকে পাকে হৃদয় খোলে, সে খোলাটার
অন্য মানে আছে ।

ঘুমের মধ্যে দেখি আলোর ভরা-কুসুম নীলাংশুকে
বাঁধতে পারে না এ :
উঠেই দেখি কী বিচিত্র, একটি আঁচড় লাগেনি তার
ভালোবাসার গায়ে !

বলেছিলাম তোমায় আমি ছড়িয়ে দেব দূর হাওয়াতে
সেই কথাটা ভাবি।
তোমার বুকের অন্ধকারে সুখ বেজেছে মদির হাতে
সেই কথাটা ভাবি।

স্তব্ধ সুদূর প্রান্ত

স্তব্ধ সুদূর প্রান্তে ওড়াও উত্তরীয়
দৃষ্টি মেলুক দেশান্তরের মুগ্ধ হাওয়া
যুক্তচরণ ছন্দে প্রাণের মুক্তি নিয়ো
সমাপ্ত হোক সমাপ্ত হোক ক্লান্ত চাওয়া।
তাই নিয়ে যাই করুণ মুখের অন্ধকারে
চুপ থাকা এই মন ভেঙে যাক একশোধারে !

স্তব্ধ সুদূর প্রান্তে প্রাণের জয়ধ্বজা
রক্ত নাচায় শ্রান্তিবিহীন হাতছানিতে—
যতই ব্যাকুল চক্ষে তাকাই, অন্ধ বোঝা
হারায় হারায় দীর্ঘ ভারে, মিথ্যে শীতে।
তাই দিয়ে যাই করুণ ছবির অন্ধকারে
গানের মতন পাইনা আমি পাইনা তারে।

স্তব্ধ সুদূর প্রান্তে হাওয়ায় দীপ্ত আলো
ঝলমলাল ব্যাপ্ত আশার কীর্ণ আবীর

কাঁপতে থাকা আকাশে তার আগুন ঢালো
চমকে উঠুক হৃদয়খানা সে-বিদ্রোহীর—
এইটুকু চাই করুণ চাওয়ার অন্ধকারে
দাও ভেঙে দাও স্তব্ধ সে চোখ অশ্রুভারে।

পলাতকা

প্রলাপমগ্ন কড়ি-কাঠ-গোণা দিবাস্বপ্নকে খতিয়ে
দেখো পালিয়েছে ক' টিয়ে—
লাল-ঠোঁট টিয়ে অমূল্য কাল আচমকা গেছে কাটিয়ে!

তর্জনী, পরো মিজ্‌রাপ, আর
নায়কীতে দাও ক্ষীণ টান—
সময় তোমার বিলাসপণ্য
তোমাকে আমরা চিনতাম!

এই দিগন্ত দেখে গেলাম
এখানে জীবন তথৈবচ!
বলে, এ-জন্ম মিছে নীলাম
আগামী স্বপ্ন যতই রচ।

প্রাণধারণের দিনযাপনের গ্লানি? নাকি তারা হর্ষ?
একটি ধানের শিষের উপর
সকল জীবন ভরসা।
কবন্ধ মাঠ, ধান খেয়ে গেছে বুলবুলি আর বর্গি
অগত্যা তুমি শ্রীযুধিষ্ঠির—
মহাপ্রস্থান স্বর্গে।

মিছে উশ্‌কালে সল্‌তে
তেল বাড়স্ত শিয়রে।
একটু আর্জি বলতে
ডাক দেবে যেই প্রিয়রে

সে প্রিয় তখন ধূ ধূ মাঠ জুড়ে খাজনার ধান খুঁজছে !
কতটুকু বলো কুলায় করুণ
রঙিন তরুণ সহে ?

সময় তোমার বিলাসপণ্য
তোমাকে আমরা চিনতাম—
তর্জনী, পরো মিজ্‌রাপ, আর
নায়কীতে দাও ক্ষীণ টান !

কবর

আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে—
গোপন রক্ত যা কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে।
কঠিন মাটির ছোঁয়া বাতাস পেয়েছি এই সমস্ত দিন—
নিচে কি তার একটুও নয় ভিজে ?
ছড়িয়ে দেব দুহাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা,
যেটুকু পাই প্রাণের দিশা নিজে।

ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল শুধুই আগলে রাখা
তোমার কোনো কাজেই লাগেনি তা—
পথের কোণে ভরসাহারা পড়ে ছিলাম সারাটা দিন—
আজ আমাকে গ্রহণ করো মিতা !
আর কিছু নয়, তোমার সূর্য আলো তোমার তোমারই থাক
আমায় শুধু একটু কবর দিয়ো
চাইনে আমি সবুজ ঘাসের ভরা নিবিড় ঢাকনাটুকু
মরাঘাসেই মিলুক উত্তরীয়।

লজ্জাব্যথা অপমানে উপেক্ষাতে ভরা আকাশ
ভেঙেছে কোন্ জীবনপাত্রখানি—
এ যদি হয় দুঃখ আমার, তোমায় নয়তো এ অভিযোগ
মর্মে আমার দীর্ঘ বোঝা টানি।
সেদিন গেছে যখন আমি বোবা চোখে চেয়েছিলাম
সীমাহীন ওই নির্মমতার দিকে—

অভিশাপ যে নয় এ বরং নির্মমতাই আশীর্বাদ
হে বসুধা, আজ তা শেখেনি কে।

রক্তভরা বীভৎসতায় ভরেছে তার শীর্ণ মাটি
রিক্ত শুধু আমাদের এই গা-টা
টানাটানা চক্ষু ছিঁড়ে উপচে পড়ে শুকনো কাঁদা
থামল না আর মরুবালুর হাঁটা!
যে পথ দিয়ে সূর্য গেল ছায়াপথও তার পেছনে
হারিয়ে যায় লুকিয়ে যায় মিশে
ঘোড়ার ক্ষুরে থিঁতাল বুক অলজ্জ সে আলোর ধারা
দীপ্ত দাহ ভরেছে চোখ কিসে!

কুণ্ডলিত রাত্রিটা আজ শেষ প্রহরে ভাসাল স্বর
'তুমিই শুধু বীর্যহারার দলে,
ঋজু কঠিন সব পৃথিবী হাড়ে-হাড়ের ঘষা লেগে
অক্ষমতা তোমার চোখের পলে।'
নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা –
মাটি আকাশ বাতাস যখন তুলবে দুহাত, আমার হাড়ে
অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।

পৃথিবীর জন্য

আমার আশ্লেষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে নাও।
যদি আমি অন্যমনে অন্যপথে নিভৃত রেখায়
শালপ্রাংশু অরণ্যকে ভীরু হাতে সুপ্ত করে আনি,
যদি আমি বজ্রমূল মেঘে মেঘে উধাও উধাও
স্বপ্ন ঢালি, যে-চোখ ঝড়ের রাত্রে বিদ্যুৎ বাঁকায়

যদি তাকে চুম্বনের ক্লীব দানে করি শ্লথবাণী—
আমার বন্ধন থেকে তাহলে পৃথিবী মুক্তপাণি
করো। শুধু ভরে দাও পৃথিবীকে উন্মাদ কেকায়,
বৃষ্টি হোক ঝড়ে।

আমার দুঃখের রাত্রে পৃথিবীকে কৃপণের মতো
ভালোবাসি, সে আমার জয় নয়, ভীরুর আশ্রয়!
আমার আশ্লেষ-জীর্ণ পৃথিবীকে ছিন্ন করো করো,
প্রচণ্ডের বর্শা তুলে বুকে বিঁধে আমাকে আহত
করো তুমি, রেণু রেণু করে তুমি আমাকে বিলয়
করো আর পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে থরোথরো
ব্যাপ্ত করো সেই রেণু! আমার জীবন থেকে বড়ো
পৃথিবী বিস্তৃত করো দৃঢ় মেঘে তৃণে সূর্যে, ভয়
জীর্ণ তার ঝড়ে।

আমার আশ্লেষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করো তুমি!

শিশুসূর্য

এ কোন্ দেশ?
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িতমুখে
শিশু তার জন্মে পায় দুর্বল দুয়ারে হাহাকার
ক্ষীণকায় শিবিরের বজ্র-আলিঙ্গনে হুতাশী জনসঙ্ঘের গুরুসংখ্যা—
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িতমুখে
আমার রাত্রি আমার দিন তার কটাক্ষে বিপন্ন দয়িত
এ কোন্ দেশ?

এ কোন্ চঞ্চল প্রাণ অন্ধকার যন্ত্রণার গর্ভচ্ছেদ ক'রে
বর্বর-আদিম-শাপ মুক্ত হতে চায় বারবার,
নিত্য চায় বহির্মুখ শিশুসূর্য শিশুকলি শিশুসুন্দরের
অন্তরীণ আলোকণা সোনালি জটাতে রচে শুভ্র নবকায়া !
এ কোন্ চঞ্চল প্রাণ বন্ধদ্বার দেয়ালে দেয়ালে
অনিবার মাথা কুটে বীভৎস রক্তিম উপহাসে
নিত্য চায় বহির্মুখ শিশুসূর্য শিশুকলি শিশুসুন্দরের
শুভ্র নবকায়া !

তেজকরুণ সূর্য,
তমালতালী বনরাজিনীলা,
শ্যামলী চক্রবাল, স্তবকাবনম্র ফুল্ল কুসুমপুঞ্জ !
জানি তার প্রচণ্ড সৌন্দর্যের অন্তর্মর্ম ছিন্ন শতলেখা
কত অভিসারলগ্নে জয়চিহ্ন আঁকে ললাটে ললাটে ।
তার সুনিবিড় উষ্ণ প্রসাদে প্রসন্ন যাত্রা এগিয়ে যায় অকৃপণ —
যদিও মৃত্যু তার অবাধ দাক্ষিণ্যে বারংবার শূন্যে নিক্ষেপ করে
জীবন,
এবং কৃতাঞ্জলিতে ভয়ের অগস্ত্য পান করে
জীবনের প্রবালপ্রশান্ত বিস্তার (ওগো মরণ হে মোর মরণ) !

এ কোন্ দেশ ?
তোমার শরীর শিশু মৃত্তিকায় লগ্ন করে করে
শৈশব কামনা করে দেশমাতা দেশ
এ কোন্ দেশ
অসংখ্য-শিবিরে-রুদ্ধ শিবির কামনা করে
এ কোন্ দেশ ?

ঘরেবাইরে

এই সেই অনেকদিনের ঘর, তার দেয়াল ফাটছে, আশা ফাটছে।
যেদিকে তাকাই তার নির্বোধ নীরব চোখ,
ভীষণ লজ্জাহীন একঘেয়ে সূর্যহীন গন্ধ
বৎসরের পর বৎসর একখানি করে টালি খসিয়ে মাথা তুলছে।
বৃদ্ধা ঠাকুমার নামাবলির মতো মূঢ় দেয়ালের অসহ্য দুরবলোক্য তর্জনী
তাকিয়ে মনে হয়
আশা নেই আশা নেই
আমার বয়স হাজার কিংবা এ-রকম
আর সামনের ভবিষ্যৎ মানেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধ বর্বর যুগ
যে মারে সেই বাঁচে—
অন্তত মা-র মুখে তাকিয়ে এ-ছাড়া আর কোন্ আশা ?

আমি জানি মায়ের এই দম্ভ ঘুচবে না কোনোদিন
অকুলানের সংসারকে কুলিয়ে দেবার দম্ভ—
এ দুঃসাহসিক স্পর্ধা তার ভঙ্গুর পদক্ষেপেও কী আশ্চর্য প্রখর ফোটে।
কিন্তু তবু
তবু তার আঙুলের পঞ্চমুদ্রার বঙ্কিমভঙ্গিতে বিধাতা ঝিলকিয়ে ওঠেন হঠাৎ
আর স্পর্ধার মেরুদণ্ডে সেই আদিম হা-কপাল শিরশির করে ওঠে
'আর পারি না
তোমরা বরং এই দুর্দম ভার গ্রহণ করো, আমি দেখি
কী আলাদিনের প্রদীপে খরচ কুলোয় রাবণের।
আর ভগবান,
সংসারের কোন্ সাধটা-বা মিটল এই অফুরান ঘানি টেনে টেনে।'

এমন ললিত সন্ধ্যা সোনার পঞ্চপ্রদীপ ছোঁয়াবে শান্ত ছেলের মাথায়
(হায়রে শান্তি)

ধানের শিয়রে পায়রা
(হায়রে শান্তি)
প্রজাপুঞ্জ বাইরে বেরোয় ঘর ছেড়ে কোন্‌খানে একটু নিশ্বাস মিলবে
শূন্য নীলে কিংবা শহরে
যেখানে ঘর নেই, ঘরের নৈরাশ্য নেই, ঠাকুমার চোখ নেই !

তারপর
সারাদিনের ক্লান্তি মিশে মিশে
সেই অস্বচ্ছ দিনান্তে ভয় নেমে ভীষণ
বাহির কৈল ঘর।

আর দেখব না সেই লাঞ্ছিত চোখ।
যার এক চোখ হাওয়ায় পণ্ডগ্রাস দেখে দেখে ভয়ে স্থির,
ধর্ষকাম পৃথিবীর হাত থেকে, শূন্যবন্ধন থেকে
কেঁপে কেঁপে পেছোতে চায়, দেয়ালে লেগে লেগে রক্তের মতো নিশ্বাস টলছে—
আরেক চোখে ভীষণ নির্লিপ্ত ক্ষমা নীরব থেকে থেকে
লজ্জাতুর করে তুলছে যৌবন !
ওগো পসারিনী, যৌবন নীলাম করে ঘাটে ঘাটে
এমন নিষ্ঠুর ক্ষমায় বিঁধো না আমায় যৌবনবতী—
আমি তোমার বন্ধু।

এই অজস্র বলি (মাগো !)
বালির নিচে নিচে কবর কামনা করে,
কতদূর থেকে তৃষ্ণা এসে এসে সমুদ্র ছুঁতে পায় না।
আর মায়ের যন্ত্রণা !

এ কোন্ সৃষ্টির যন্ত্রণা !

সপ্তর্ষি

"Strait is the gate and narrow is the way which leadeth unto Life ; and few there be that find it."—*New Testament.*

আমি প্রায়ই ভাবি, মেঘলা-টোপর সন্ধ্যাকে ভালোবাসব প্রিয়ার মতো
হাত বাড়িয়ে ডাকব তাকে এসো এসো। এসো
প্রাত্যহিকের দিনযাপনকে জীবন করে ভরিয়ে দাও—
আমি প্রায়ই ভাবি

সাত ঋষি নিত্য জাগে আকাশে প্রশ্নচিহ্ন তুলে
অন্ধকারের অনিবার্য সূচীভেদ্য আক্রমণ বেদনার ঢেউ তোলে
বুকের উপান্তে,
কঠিন আবিলতায় আচ্ছন্ন নীরক্ত কৃষ্ণ চক্ষু
অগণ্য বুদ্‌বুদের রাশীকৃত অনিশ্চয়তার মধ্যে
মুহুর্মুহু সে-প্রশ্নের উত্তর জোগাবার ভান করে !

ইতিহাস স্থির এবং কঠিন
এবং অকম্পিত কৃপাণশোভিত বজ্রহাত দৃঢ় থেকে দৃঢ়
ক্ষমা জোগায় না তার নির্দেশে।
তিথিতে আর তিথির বাইরে তার মহাশ্বেত ঘোষণালিপির
শমন পৌঁছয় দ্বারে দ্বারে—
অকৃপণ তার কণ্ঠ :
প্রত্যুষের পাখিকূজন ঘুমভাঙানোর বার্তা আনবে জেনে
শয্যাপিষ্ট যে নিরাসক্ত মন
ইতিহাসের কুঠারে ঈশ্বরের টুকরো-টুকরো-খণ্ড অভিশাপ
বর্ষণ করে তার মাথায়,
মৃত্যুর শোচনীয় গহ্বরে মুহূর্তে তলিয়ে যায় তারা ;
এবং আর এক মহান মৃত্যু দুর্গম নিশ্চিতের লালপথে
আহ্বান জানায় সকলকে।

মহত্তো মহীয়ান দেদীপ্য আশা আমার সামনে,
সপ্তর্ষির প্রশ্ন কোটি হৃদয়ে আবেগবন্ধুর জিজ্ঞাসার অনুরণন তোলে
সতত তরুণ যাত্রা
বিদ্রোহী নবকেতন কুয়াশালীন পথের প্রস্তুতি স্থির করে
আর ঘোষণা করে—
'জীবনের দ্বার সংকীর্ণ এবং পথ দুর্গম
অল্প লোকেই তা পায়' :
কেননা আমরা সেই কতিপয়ের অন্যতম।

মেঘ থেকে ছিন্ন বৃষ্টিতে আমরা সিক্ত
এবং আমাদের ডেরায় পানীয়ের সন্ধান নেই কোনো—
মৃত্যু যদিও তোমায় স্তূপ স্তূপ জমায়
বৃষ্টি তাকে বন্যা ক'রে কঠিন ছল ভাঙছে।

একটি দুর্গের কাহিনী

[প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যকে]

১

ক্রৌঞ্চমিথুন জীবনস্বপ্ন গেঁথে গেঁথে দিন ক্লান্ত
আজ প্রত্যুষে বিস্মিতচোখ জটায়ু-জরদ্গব
জীবনকৃত্য ইঙ্গিত করে। সীতার চক্ষুপ্রান্ত
বৃদ্ধশক্তি তীক্ষ্ণজ্বালায় জাগাল। হত স্তব।

আমরা এখন জটায়ু
ছিন্নভিন্ন পক্ষ যদিও, ক্ষতরক্তের বাহু
মুমূর্ষু শ্বাসে উদ্যতটান—তোমায় চিনেছি রাহু।

পুষ্পোদ্যানে হৃদয়বিছানো ছায়াপথ নাকি লিপ্ত ?
স্বপ্ন কে বোনে ? কে গাঁথে জীবন ? ঘরের মলিন দীপ তো
তেলের তৃষ্ণা জপে আর মরে দধীচির হাড় রেখে—
ক্রৌঞ্চমিথুন জীবনগন্ধে সে-হাড় দেখে নি কে কে ?

আমার স্বপ্ন অশনি
হৃদয়ের শ্বাসে বজ্রবাহুতে চমকে উঠছে শনি
মুমূর্ষু পল-বিপলে শুনছি তোরণযাত্রা-ধ্বনি ।

শান্ত সাগরনদীর চিহ্নে জল্পনা ছিল ঋদ্ধ
অন্তবিহীন মনে মুদ্রিত জগৎ স্বপ্নসিদ্ধ !
কঠিন গোপন সবুজ স্নিগ্ধ নিবিড় দুর্গ মনে
অতীব শান্তি-প্রতীক গন্ধ এসেছিল ক্ষণে ক্ষণে ।

আমরা কোথায় জগৎ ?
ললাট-লভ্য ভাগ্য দুরাশা ! মনঃসীমায় পথ
হারিয়ে অন্ধ—তবু প্রত্যয়ে ঋজু এই মনোরথ ।

আদিঅন্তের স্বপ্ন এবং আদিগন্তের চিহ্ন
কুয়াশায় মোড়া ! তবে কি আমার জীবনযাপন ভিন্ন ?
চকিতে দেখেছি দুর্গ ধ্বস্ত হৃদয়ের মৃত কোণে,
অতীব শান্তি-প্রতীক গন্ধ এসেছিল নাকি মনে ?

আমার মূর্ছা ক্ষণিক—
প্রত্যাশাহীন জীবনে আবার শর্ত জেগেছে ঠিক ।
বন্ধু আমায় গ্রীবালিঙ্গন ভোলায়নি দশদিক ।

বন্ধু আমার অপার সন্ধ্যা আসে
দিনান্ত মোছে করুণ ক্লান্ত রথ

সপ্তবর্ণ চিত্রিত বিন্যাসে—
অথচ নিরাশা সন্ধ্যায় এ-যাবৎ !

প্রাণান্ত স্বেদে কালের অমোঘ জট
গোলকচক্রে ধায়, তার শেষ পাওয়া
বনকল্প-এ রাজপথে দুর্ঘট।
তোমার হৃদয়ে শোণিতসিক্ত হাওয়া।

আশা হতে এই হতাশায় যাওয়া-আসা
সন্ধ্যাকাকলি সন্ধ্যাকাকলি নয় !
উন্মুখ চোখে জীবন-নিষ্ঠ ভাষা—
বন্ধু, এখনো ক্লৈব্য দুরত্যয় ?

বসন্তে কাঁপে দীর্ঘ বনস্থলী
শহরে আর্য-অনার্য সংগ্রাম
বসন্তে কাঁপে দীর্ঘ বনস্থলী
কত কোটি মনে অনার্য সংগ্রাম !

নীরব শাঠ্যে যদিও অক্টোপাস
নিখিল আকাশে ব্যাপ্ত : কঠিন শ্বাস,—
বন্ধু, আমার উদ্দেশে এ-জীবন
সংগীত-ঘন সন্ধ্যায় আনে মন।

তোমারও মনের বিবর্ণ কোণে কত
ক্রৌঞ্চমিথুন হয় এ' নয় ও' হত !
কুয়াশামলিন অতীতস্বপ্ন জুড়ে
প্রেয়সীর বাসা রূপরাজ্যের পুরে।

আমার জীবন ডোরকৌপীন-মূল
আমার হৃদয়ে নানান রৌদ্র মেঘ

আমার হৃদয় পর্বতসঙ্কুল
আমার জীবন কঠিন স্রোতের বেগ।

বন্ধু, আমার সামনে রিক্ত ঘন
অন্ধকারের কর্কশ বিষে নীল
মূর্ছায় ক্ষীণ জীবনে কি একজনও
দেখায়নি পথ ?   জীবনে ঘটেনি মিল ?

দৃঢ়সম্ভব উপসংহারে তবু
যে আসে সে আসে, আমিও এসেছি জেনে
তোমারই হৃদয়ে আমার হৃদয় কভু
আমার হৃদয়ে তোমার হৃদয় মেনে।

ক্ষীণাঙ্গ এই অভিজ্ঞতায় তোমায় পেতে তো চাইনি।
জনতাশূন্য নিরেট কক্ষে নীরব প্রণয়কথন
বৈভব মোছে জীবনে, জীবনে অঙ্গুলচিহ্ন ডাইনী
কঠিন কবলে হৃদয় বাঁধছে রাহুর প্রেমের মতন।

যে আসে সে আসে প্রতিজ্ঞাহীন ক্ষণভঙ্গুর জীবনে,
এক হয়ে যায় প্রখর গ্রীষ্মে শীতে আর ভরাবাদরে।
আমার তৃপ্তি প্রত্যঙ্গের সংগত অনুসীবনে—
যে নেয় সে নেয় বিকলাঙ্গের ক্লৈব্যের শ্বাস আদরে

বন্ধু আমার নিকটসন্ধ্যা হাতে নিয়ে দেখি মিথ্যে !
এই ভবিষ্যে ঋণশোধ চাই, আমরা দুয়োরে তৈরি।
যেখানে আঙুল যেখানে আঙুল সেখানে সেখানে বৈরী—
বন্ধু আমরা এই ভবিষ্যে পারব জীবন জিততে।

সেই তাকে

অন্ধকারে দুই চক্ষু জ্বেলে
যে চলেছে, যাকে তারা নাম দেয় অবিমৃষ্য ছেলে,
ভবিষ্য পাথেয় ভেবে দৃঢ় ক'রে বাঁধেনি যে ঘর,
চোখে যার মুখে যার যার দুটি আনন্দিত হাতে
নাচনে মাতাল হয় দুর্বিনীত ঝড়—
পথে পথে উল্লাস অথই বাঁধে যাকে, যাকে গাঁথে
সন্ধ্যা তার পুঞ্জীভূত রক্তিম ফেনায় সন্ধ্যাকাশে—
সেই তাকে নিত্য খুঁজি কিন্তু কই নিত্য আসে না সে।

কিংবা সেই মেয়ে
চক্রান্তে আত্মগুপ্তিপ্রিয় সংসারের চোখে চোখ চেয়ে
ভোলেনি যে দগ্ধ প্রেম, ছেঁড়েনি যে প্রাণে প্রাণে মিল,
ব্যবহারে তুচ্ছ তবু প্রাত্যহিক বিকেলে নিখিল
যার তপ্ত হাতে প্রাণ পায়, নামে পিপাসার্ত ভিতে—
আবিষ্ট দুচোখে যার উচ্ছ্বসিত কথা ফেরে স্বপ্ন দিতে নিতে
নিজেরই সঞ্চয় থেকে সন্ধ্যা যাকে, স্নেহ ঢালে ক্লান্তিহীন অনন্ত অভ্যাসে—
সেই তাকে নিত্য খুঁজি তবু কই নিত্য আসে না সে।

খণ্ডিতা

আশ্বাসে-সংশয়ে জীর্ণ আন্দোলিত অপরূপ এ-আমার দেশে দেশে ঘুরে
আমি যদি পথে পথে একমুঠো বাঁচবার মতো প্রাণ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হই
তখন তোমার চোখ একা একা আকাশের মতো ম্লান কেঁপে
মেঘে মেঘে বুক ভরে তপস্যার মতো।

সে তখন প্রেমে প্রেমে দীর্ণ করে বুক, তার দুটি শীর্ণ দীর্ঘ জলরেখা
পাণ্ডুগালে কাঁপে আর জ্যোৎস্না এসে মোছে তার কলঙ্কের আদরিণী ছায়া
পাহাড়ে পর্বতে সেই একই জ্যোৎস্না নিদ্রাহীন শিয়রে আমার
দীপ্ত করে প্রতিজ্ঞার আরক্তিম ক্ষত।

সে কলঙ্কময়ী মেয়ে বিচিত্র আশ্বাসে তবু মুখ তুলে চুপি চুপি ডাকে;
ভুলিনি তোমাকে আমি ভুলিনি—
তারই শব্দে আমি ছুটি দিগন্তরে দিগন্তরে তমিস্রার মতো বন্ধহীন
: ভুলো না আমায় তুমি ভুলো না—
সে তখন প্রেমে প্রেমে দগ্ধ করে দিন তার আন্দোলিত অপরূপ দেশে।

জ্যৈষ্ঠ '৬০

অগ্নিজোড়া তেপান্তরে ধূ ধূ বালুর মাঠ—
সেইখানে সে একলা হাঁটে, সেইখানে সে কাঁদে।
গ্রীষ্ম এল শূন্য কাঁখে—পোড়া এ তল্লাট
কপাল খুঁড়ে মরল, ও মেঘ বর্ষা দে বর্ষা দে—
বর্ষা দিল না:
চক্রবালে চক্রবালে তৃষ্ণা দিল পা।

আকাশে এক সোনার বাটি উপুড় করে তাপ
বিবশ হলো দুপুর তার দগ্ধ দাহে বিঁধে—
সোনার বৌ বন্ধ ক'রে সংসারের ঝাঁপ
শুকনো চোখে তাকায়, বলে—বৃষ্টি দে বৃষ্টি দে—
বৃষ্টি হলো না:
এই কুটিরে ওই কুটিরে গ্রীষ্ম দিল ঘা।

একটি ছোটো রজনীফুল একটি ছোটো মুখ
তুলতে গিয়ে ভাবল কী যে জানল না তা কাল!

সন্ধ্যা নামে কাঁপন তুলে গন্ধে ভ'রে বুক,
সেই ঘাটে কে একলা কাঁদে, অঝোরে জল ঢাল্—
জল সে ঢালে না :
জ্যৈষ্ঠে এ কী গ্রীষ্ম হলো দারুণ ললনা।

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে

তুমি মাটি ? কিংবা তুমি আমারই স্মৃতির ধূপে ধূপে
কেবল ছড়াও মৃদু গন্ধ আর আর-কিছু নও ?
রেখায় রেখায় লুপ্ত মানচিত্র-খণ্ডে চুপি চুপি—
তোমার সত্তাই শুধু অতীতের উদ্দাম উধাও
বাল্যসহচর ! তুমি মাটি নও দেশ নও তুমি।

নদী তুমি ? সে তোমারই শৈবালের আচ্ছাদনে ঢাকা
বেদনার ধারা চলে আসমুদ্রহিমাচল ক্ষীণ—
আমার হৃদয় তার দ্বীপে দ্বীপে পুঞ্জ করে তাকে
খালে বিলে ঘাসে ঘাসে লেখা যেই বিদায়ের গান,
বেদনার সঙ্গী, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি।

তুমি দেশ ? তুমিই অপাপবিদ্ধ স্বর্গাদপি বড়ো ?
জন্মদিন মৃত্যুদিন জীবনের প্রতিদিন বুকে
বরাভয় হাত তোলে দীর্ঘকায় শ্যাম ছায়াতরু
সেই তুমি ? সেই তুমি বিষাদের স্মৃতি নিয়ে সুখী
মানচিত্ররেখা, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি !

বলো তারে 'শান্তি শান্তি'

মাগো, আমার মা—
তুমি আমার দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

এই যে ভালো ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ারহারা পথ,
এই যে স্নেহের সুরে-আলোয় বাতাস আমায় ঘর দিল রে দিল—
আকাশ দুটি কাঁকন বাঁধে, বলে, আমার সন্ধ্যা আমার ভোর
সোনায় বাঁধা—ভুলে যা তুই ভুলে যা তোর মৃত্যু-মনোরথ!
সেই কথা এই গাছ বলেছে, সেই কথা এই জলের বুকে ছিল,
সেই কথা এই তৃণের ঠোঁটে—ভুলে যা তুই, দুঃখরে ভোল্ তোর,
ধুলোতে তুই লগ্ন হলে আনন্দে এই শূন্ত খোলে জট!

তুমি, আমার মা—
শান্তি তোমার ঘট ভরেছে, দুঃখ তোমার পল্লবে কি গাঁথা?
তুমি আমার চক্ষু ছেড়ে কোথাও যেয়ো না!

আকাশ বলে বাতাস বলে ব্যথা।
ব্যথার তুলি পলাশলাল মেঘে।
ভাঙলে তুমি প্রেমের নীরবতা
দুঃখ আমার টলবে বুকে লেগে।

দুঃখ আমার বুকের টলোমলো
জলের বুকে সন্ধ্যা দিল এঁকে—
ব্যথায় লেগে বন-বনানী হলো
আমার মতো, আমার মতো কে কে?

আমার মতো বাতাস জানে ভানা,
আমার মতো সূর্য জানে ফুল,

তোমার চোখে নিদ্রা হলো টানা
মরণমুখী সূর্য আর জাগনলোভী চাঁদে
আকাশ পরে স্নিগ্ধ দুটি দুল !

৩

মাগো, আমার মা—
তুমি আমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

মৃত্যু তোমায় ভয় পেয়েছে, রাত্রি এল অস্তদিঘির পার,
যেখানে এই চোখ মেলেছ সেইখানে কার শাস্তি কেঁদে মরে ?
নিশুতি রাত ঝুমঝুমিয়ে আর্তনাদের বর্শা এল ছুটে—
যেখানে যাও সেখানে নেই শাস্তি তোমার সেখানে নেই আর !
দিন ছুটেছে রৌদ্ররথে শহরগ্রামে সাগরে-বন্দরে
যেখানে যাও সেখানে চাপরক্ত পাবে শীর্ণ করপুটে—
আকাশ-ভাঙা বন-বনানী শাস্তি বাঁধে শাস্তি বাঁধে কার !

তুমি, আমার মা-
শাস্তি তোমার ঘট ভরেছে, রক্তে ঘটের সিঁদুর হবে টানা,
তুমি আমার ঘর ছেড়ে মা কোথাও যেয়ো না।

৪

বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন ?
নীলদুয়ারে ঘা দিল ভাই মেঘের সেনাগুলো।
বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন ?
ভয়ের দুয়ার-বন্ধ ঘর কাঁপছে জড়োসড়ো—
বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে বড়ো !

মাগো, আমার মা—
ঝড় নেমেছে দুয়ারে তার ঝঞ্ঝা লাগো-লাগো
তুমি আমার বাজনা শুনে শঙ্কা মেনো না।
বাজনা বাজুক, ভয় পেয়ো না, বাজনা বাজুক মা !

যমুনাবতী

One more unfortunate
Weary of breath
Rashly importunate
Gone to her death.
Thomas Hood

নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে !
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী
দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি'।

হায় তোকে ভাত দিই   কী করে যে ভাত দিই হায়
হায় তোকে ভাত দেব   কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়

নিভন্ত এই চুল্লী তবে
একটু আগুন দে—
হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে !
দু'পারে দুই রুই কাৎলার
মারণী ফন্দি

বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
মৃত্যুতে মন দি'।

বর্গী না টর্গী না, যমকে কে সামলায়!
ধার-চকচকে থাবা দেখছ না হামলায়?
যাস্‌নে ও-হামলায়, যাস্‌নে!

কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না—
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না—
চলল মেয়ে রণে চলল!
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝন্‌ঝন্ করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল!
পেশির দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল।

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা—
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু'তিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক্ ধক্, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি!

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।

নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন্ আগুন ফলেছে!

সূর্যমুখী

ইচ্ছে হলো ব্যাকুল, তবু খুলল না সে ঘর
অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠল স্বর
'এ যে বিষম ! এ যে কঠিন !'
কী যে ছোট্ট বাড়ি—
সকালও তার মুখ দেখে না, বিকেল করে আড়ি !

শীতল মুখে শূন্যে ঝোলে সূর্য সারা দুপুর
ঘরেতে তার তাপ পৌঁছয়, জ্বর হয়েছে খুকুর ।
শুকনো ভাঙা বেদানা তার মাথার কাছে খোলা,
ছোট্ট দুটো হাত ভরে দেয় বুকে কঠিন দোলা,
লালছলোছল আলগা চোখে তাকাল ভয়-ভয়,
যে দেয়ালেই চোখ পড়ে তার সে দেয়ালেই ক্ষয়
হঠাৎ জোরে কেঁপে উঠল, আলো দেখব মাগো—

এ কী বিপুল সহ্য সখী ! জাগো কঠিন জাগো !

বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন ভারি
সকালও যার মুখ দেখে না বিকেল করে আড়ি ?

অন্যরাত

মনের মধ্যে ভাবনাগুলো ধুলোর মতো ছোটে
যে কথাটা বলব সেটা কাঁপতে থাকে ঠোঁটে,
বলা হয় না কিছু—
আকাশ যেন নামতে থাকে নিচুর থেকে নিচু
মুখ ঢেকে দেয় মুখ ঢেকে দেয়, বলা হয় না কিছু ।

মুখ ঢেকে দেয় আড়াল থেকে দেখি পক্ষ্মপুটে
জলে অম্‌ল বেদনা আর কেঁপে দাঁড়ায় উঠে
নানারঙের দিন—
সোনার সরু তারে বাজনা বাজে রে রিন্‌রিন্‌
বেদনা তার জাগায় মধু-হাওয়ায় ভরা দিন।

মস্ত বড়ো অন্ধকারে স্বপ্ন দিল ডুব—
বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন খুব ?
মিলাল সংশয়—
শাদা ডানায় জল ভরে কে তুলল বরাভয়
কঠিন নয় কঠিন নয় বাঁচা কঠিন নয়।

এই প্রকৃতি

ঘুরে ঘুরে এই প্রকৃতি কী কথা কয় ?
সে বলে যায় প্রেমের মতন আর কিছু নয় !

এই যে ভালোবাসছি আমি সাতসাগরা ধরিত্রীকে,
এই যে স্নেহের সুধা, সুধায় ছড়িয়ে দিলুম শরীরটিকে—
স্নিগ্ধ সবুজ ললাট মেলে সেই যেখানে দিগন্তে সে
আপন মনে তাকিয়ে থেকে একটুখানি স্বপ্নে মেশে—
তার বুকে যে শ্রান্তিবিহীন তৃপ্তিবিহীন জ্বলছে প্রণয়
কেউ জানো তা ?   সে শুধু কয়, প্রেমের মতো আর কিছু নয়।

এখন তখন যখন যাকে দেখছি মনে হচ্ছে চেনা
হাত বাড়িয়ে ডাকছে তারা, ‘দে না রে ভাই, হৃদয় দে না’।
দুচোখ ভরা স্নেহের প্লাবন, শূন্যে নাচে প্রাণের মুঠো,
বাঁধনহারা কাঁপন তোলে উদাসী দিনরাত্রি দুটো—

সবাই মিলে তারা আমায় গুনগুনিয়ে কেবল শোনায়,
তোমরা শোনো, প্রেমের মতো আর কিছু নয় আর কিছু নয়।

সে তো কেবল এই কথাটাই গুনগুনিয়ে নৃত্যে ফেরে
'দে তোরা দে, আমার বুকে স্নেহের আগুন জ্বালিয়ে দে রে।'
আকাশ-ভরা নীল টলেছে মাটির ভরা-বুকের টানে,
একূল ওকূল দুকূল ভেঙে জল ছুটে যায় কী সন্ধানে,
গাছ কেঁপে যায় ফুল তোলে মুখ, সন্ধ্যা-ভোরের আলোর বিনয়—
সবাই মিলে গান তুলেছে, প্রেমের মতো আর কিছু নয়।

পথ

পথের বিলাস যায় পথে পথে বিলাতে বিলাতে—
উদ্‌বৃত্ত থাকে না কিছু—এ বড়ো আশ্চর্য লাগে সখী।
যত ছন্দ বাজে, যত তৃপ্তি দেখো স্ফটিকে নীলাতে
তাতে খুঁজে দেখো, প্রশ্ন করে দেখো, 'আছো কি আছো কি'—
থাকে না সে কিছুতেই, মেলে না যা কিছুতে মেলে না,
ঘরে যাকে পেতে চাও সে পালায় পথে পথে ঘুরে।
স্ফটিকে নীলায় যাকে পাও, প্রাণভরণের দেনা
তাতেও মেটে না তাই ছুটে চলি আরো আরো দূরে।

এ কেমন মন্দ নয় তবুও পথেই বাসা ভরা—
দৃষ্টিতে মেলেনি যাকে সৃষ্টি ভ'রে তাই অনুভব।
মন্দ নয় গিয়ে বসা জমায়েতে, নির্দয়-অক্ষরা
প্রকৃতির কথা শোনা, দূরাদয়শ্চক্রনিভ সব
গোল হয়ে ঘুরে যাওয়া মরীচিকাবৎ চোখে চোখে,
ফুল ছোঁড়া রঙ ছোঁড়া প্রাণহীন স্থবির ভিলাতে।
যে বিলাস অন্তহীন ধুলাগত পলাশে অশোকে
পথের সে প্রেম যাক পথে পথে বিলাতে বিলাতে।

ঘনমায়া

যে যে রঙ লাগে এই প্রাণের প্রসারে তাকে রাখো,
বিমুখ হয়ো না মগ্ন পৃথিবীর প্রাণের প্রবাহে।
বিশীর্ণ কোরো না ধারা, ঘুরে ঘুরে যতই বিলাক্ ও
মাটিতে ক্ষয়ের লেখা, ছায়াতে ভয়ের লেখা। বা এ
প্রসন্ন প্রভাতে যদি দেখো প্রেমে আবিষ্ট দুচোখে
সকলই তোমার গান সকলই তোমার গান—যদি
অসংখ্য আনন্দভরে দুহাতে জীবন দাও ওকে—
মোহ নয় মোহ নয়: এ-চাওয়াই সমুদ্র অবধি।

দেখো কী মাটির মায়া দেখো কী গানের মায়া প্রিয়া,
তোমাকে এনেছি এই অপার ব্যবধি পার করে।

বিচিত্র লেগেছে তাকে নানা প্রাণে নানান আভাসে।
মনে হয় মৃত্যু যেন তুচ্ছ, সে তো কিছুতে পারে না
মুছে নিতে মুখ তার। কী যে তীব্র উজ্জ্বল আভা সে
মুখে, তারই ছোঁয়া লাগে সন্ধ্যাকাশে ভোরে, এই চেনা
জীবনে জীবনে তারই গন্ধ লাগে, চেনাশোনা কথা
যখনই একান্তে গোনো ছোটো ছোটো ব্যথা হয়ে ফেরে—
এ-ও যেন প্রেম এক, এ-ও এক আলস্যের লতা
ঈষৎ ব্যথিত চোখে ঈষৎ আবেশে বাঁধে এরে।

মাটির কী মায়া দেখো গানের কী মায়া দেখো প্রিয়া,
তোমাকে এনেছি এই সকল ব্যবধি পার করে।

ধানে গানে বসুধায়

আনন্দে চিরায়ু চাও, লগ্ন তুমি প্রত্যহের স্রোতে।
উদাত্ত প্রান্তর জুড়ে দুপুরের রৌদ্র পায় ছুটি—
বুকের অনন্ত ইচ্ছা ছুটে আসে ভূমিগর্ভ হতে
দুঃখের সবুজ গুচ্ছে তোমার সম্পূর্ণ হাত দুটি :

ধানে ধানে ঢেউ যেন ধান নয় ধান নয় তারা।

উপরে আকাশ ঢাকে প্রকাণ্ড ডালায় বসুধারা—
নিচে খুলে খুলে যায় সব তুচ্ছ সবুজের মুঠি,
প্রত্যেক পাতার বিন্দু দেখার আনন্দে দিশেহারা
ধানে গানে বসুধায় মিলায় অপার ভালোবাসা :

গানে গানে ধারা যেন কেউ নয় কিছু নয় তারা।

ব্যাকুল প্রাণের শব্দে মাতামাতি তপ্ত সেই দিকে
'সংগীতে রঞ্জিত হব' এই মাত্র ইচ্ছের স্ফটিকে
ঠিকরে পড়ে যৌবনের প্রাত্যহিক আলো, ফুল ফোটা

ভালো লাগে, লাগে ভালো
অসহ্য তিমিরে ভিন্ন আকাশে মাটিতে অন্ধ
প্রেমের কান্নাতে বেজে ওঠা।

সকাল ছুপুর সন্ধ্যা

বুঝতে পারি এ-শহরে সমস্ত ধুলোরই মানে আছে।
দীর্ঘ দীর্ঘ সূর্যরেখা ছিটকে গেলে ভাঙা টুকরো কাঁচে
যে আশ্চর্য মনে হয় প্রাণের সোনালি সরু সুতো—
মনে হয় সে আনন্দে আমি কিছু নই অনাহূত।
আঁকিবুঁকি গলি, পথ, দোকান-পসার, ছোটো সিঁড়ি
অন্ধকার ভিজে ঘর কুঁকড়ে থাকে মলিন ভিখিরি
তারই মাঝখানে যদি আনন্দের আশার আবেগে
চমকে ওঠে হাওয়া—তবে তারই বুকে হাত রেখে রেখে
জানতে পারি জীবনের অমেয় প্রেমের অভিমান
গান শুনে প্রাণ পায় কান্নার ক্ষুধায় ভরা কান!

বুঝতে পারি যে-আলপনা ভরে রাখে রাত্রের ভোরের
ছুখানি আকাশ আর অকস্মাৎ কোনোদিন ফের
তুলে নেয় রঙে-বোনা স্বপ্নগুলি—নিদ্রিত ছুখানি
সুন্দর চোখের ছবি আঁকে সেই ছবি জানি আমি।
জানি আমি কী-প্রত্যাশা ছুপুরের রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে
খুঁজেছি ছুচোখ ভ'রে, শুনেছি সে স্বর্গের নূপুরে
কী ভাষা, পিপাসা তার মেটেনি মেটেনি কোনোদিন—
সমস্ত ছুহাত ভ'রে এ শহর ফিরে চায় ঋণ,
হাওয়ার আঘাত এসে বুকে লেগে স্নেহে ভরে মন
কোমল কঠিন ভরা উদ্‌বেলিত স্তনের মতন!

বুঝতে পারি সন্ধ্যা তার রিনিকিরিনিকি কোলাহলে
কাঁকন বাজিয়ে গেলে, অন্ধকার বিকীর্ণ আঁচলে
স্তব্ধ ক'রে প্রাণ ফিরে চলে গেলে দূরের বাসায়।
অস্ফুট প্রণয় পেলে যে-সংকেতে মেলে তার সায়
ছুচোখে খুঁজেছি তাকে ছুটে ছুটে, পথের কাকলি
না শুনে না শুনে—কিন্তু তার শুধু কথা বলি-বলি
আভাস, বলে না কথা, তার কোনো ভাষা নেই মোটে—

জ্যোৎস্না এসে নামে ধীরে ইটের সিঁড়ির দুটি ঠোঁটে
ঠিক রাত্রি বারোটায়, ঝিকিমিকি গোলদিঘির জল,
প্রাণের দিঘিতে প্রাণ শুনে যায় প্রাণের মাদল।

দেখি, দেখি। অন্তহীন দেখে তাকে জীবনের পাশে
বুঝতে পারি এ-শহরে আমারও বাঁচার মানে আছে।

মেঘে-মেঘে

কখন মেঘের নিচে সবুজ আগুন জ্বলে ওঠে
জলের মতন তারা গলে গলে বেড়ায় আকাশে,
আভায় আভায় মৃদু মেঘের সোনালি সরু ভ্রূতে
প্রাণের বাতাস লাগে, হাওয়ার মাতন লাগে গাছে—
বলো তারে প্রেম, গান দাও তারে দুঃখের শ্লোকে
তোকে আমি ভুলব না, কিছুতে না, ভুলব না তোকে।

কখন মেঘের দিনে হাওয়ার শিহর লাগে বুকে
শীতের মতন তারা কেঁপে কেঁপে জড়ায় আবেশে,
গাছের শীতল ছায়া ম্লান চোখ মেলে যুগে যুগে,
একটি করুণ আশা একটি স্মরণে ওঠে নেচে—
তারে ভালোবাসো, ভাষা দাও তারে দুঃখের শ্লোকে .
তোকে আমি ভুলব না, কিছুতে না, ভুলব না তোকে।

কখন মেঘের বাসা ভেঙে কোনো ঝরোঝরো জলে
সুচের মতন নামে পাগল, পাগল ভালোবাসা,
'আশা ছাড়ো আশা ছাড়ো' রব ওঠে দিকে দিকে, ঘরে,
ঘরের বাঁধন ভেঙে নেমে আসে জীবনের বাঁচা—
বলো তারে প্রিয়, কথা দিয়ো তারে দুঃখের শ্লোকে :
তোকে আমি ভুলব না, কিছুতে না, ভুলব না তোকে।

ভাষা

আচারে ও আচরণে মনে হয় পিতামহী-সমা।
একটি শ্যামল রেখা পড়েনি সে-দুখানি ভুরুতে।
শৈশবসুলভ ভঙ্গি পায় না কি অবিরাম ক্ষমা
তার কাছে। তাই যদি, তাতে আর ধার্মিক পুরুতে
কী প্রভেদ? কিংবা যদি ধরো কোনো যৌবন-কল্লোলে
ডেকে আনি কুণ্ঠাহীন উন্মাদনা দুই ঠোঁটে তার—
তার দুটি চোখ যদি নিন্দার আভাসে পর্ণ খোলে
তবে তাকে প্রিয়া বলে মিছিমিছি ডাকা কেন আর?

সে বলেছে তার প্রেম ভাষাহারা স্বরের স্মরণে
ঋতুর শরীরে কাঁপে। সে বলেছে, 'তারার যাপন
কখনো দেখোনি তুমি আকাশের সুমেরু-শিখরে?
আমার প্রণয় বাঁচে তারই মতো নির্জন ভরণে।'
আমি তাকে ভালোবাসি? সম্ভবত। নতুবা এমন
দুর্বল অক্ষম ভাষা স্নেহভরে মেনেছি কী করে?

কলহপর

যত তুমি বকোঝকো মেরেকুটে করো কুচিকুচি—
আমি কিন্তু তবু বলব এ সবেই আন্তরিক রুচি:
ঘরে থাকতে অল্প মতি, রোদে রোদে পথে ঘুরে ফেরা,
আকাশে বিচিত্র মেঘ নানাছন্দে তোলে যে অপেরা
তাতে লুপ্ত হতে হতে রুক্ষ চুলে বাড়ি ফিরে আসা
পোড়া-মুখে চিহ্ন তার অকুণ্ঠ বিস্মিত ভালোবাসা!
ক্ষিদেয় তৃষ্ণায় টলে কণ্ঠাবধি সমস্ত শরীর,
অভ্যাস মরে না জেনে দুই চোখে তুমি তোলো তীর
তা সত্ত্বেও বিনা স্নানে ভালো লাগে মধ্যাহ্নভোজন।

স্বাস্থ্যকে তা ক্ষুণ্ণ করে, দিনে দিনে কমায় ওজন,
ভদ্রতা বিপন্ন হয়—নানাজনে করে কানাকানি,
এ সবই যে দুঃখপ্রদ, সন্দেহ কী, অবশ্য তা মানি।
কিন্তু তবু নিরুপায়। স্বভাবে যে পৃথিবীর মুঠি
তাকে আলগা করা তার সাধ্য নয়—প্রকাণ্ড ভ্রূকুটি
প্রকাণ্ড দুর্বৃত্ত দিন মুষড়ে পড়ে যে-আমার পায়ে
সে যে মরে ছুটে ছুটে মগ্ন হয়ে বিবিধ অন্যায়ে
তাকে কী ফেরাব আমি! অসম্ভব, অসম্ভব প্রিয়
আমাকে ভুবন দাও আমি দেব সমস্ত অমিয়।

আড়ালে

দুপুরে-রুক্ষ গাছের পাতার
কোমলতাগুলি হারালে—
তোমাকে বকব, ভীষণ বকব
আড়ালে।

যখন যা চাই তখুনি তা চাই।
তা যদি না হবে তাহলে বাঁচাই
মিথ্যে, আমার সকল আশায়
নিয়মেরা যদি নিয়ম শাসায়
দগ্ধ হাওয়ার কৃপণ আঙুলে—
তাহলে শুকনো জীবনের মূলে
বিশ্বাস নেই, সে জীবনে ছাই।

মেঘের কোমল করুণ দুপুর
সূর্যে আঙুল বাড়ালে—
তোমাকে বকব, ভীষণ বকব
আড়ালে।

নিহিত পাতালছায়া

স্বতপা-প্রত্যুম্নকে

বিপুলা পৃথিবী

একদিন সে এসে পড়েছিল এই ভুল মানুষের অরণ্যে। হাতে তাদের গা ছুঁতে গিয়ে কর্কশ বল্কল লাগে বারে-বারে।

আজ মনে হয় কেন সে গিয়েছিল। সে কি ভেবেছিল তার চিকন মোহ উদ্ভিন্ন করে দেবে অন্ধকারের শরীর? সে কি যেন মেঘলা জল কালো বনের মাথায়? প্রতিটি পাতা তার নন্দন বরণ করে নেবে সবুজ কৃতজ্ঞতায়? আঙুরের আভার মতো দৃষ্টি ধুয়ে দেওয়া প্রান্তবেলা?

আজ মনে হয় কেন সে ভেবেছিল। সেই অরণ্যের মধ্যে সেও এক তামসী বৃক্ষ যে নয়, এই কি তার জীবন?

জরাজটিল অরণ্যে তার ঠাঁই হলো না, ঠাঁই হলো না ভালোবাসার আকাশে। সে নেমে থাকল মধ্যপথের অজস্র শূন্যের মাঝখানে। নিঃসীম নিঃসঙ্গ শূন্যে কেঁপে উঠল হৃদয়, ভয়ে জমজম করতে থাকল তার রাত্রির মতো হৃদয়।

আর এই রাত্রি দুলছে নিঃশব্দ বাদুড়ের মতো তাকে ঘিরে। চোখে পড়ে তারই নিরন্ত কালোয় অন্ধ অরণ্যের মূঢ় গর্জন, 'তাকে ঢেকে দাও' 'তাকে ঢেকে দাও' রব করতে-করতে ছিটকে বেড়ালো এধার থেকে ওধার, খসে-পড়া নক্ষত্র বেজে রইল বুকের মাঝখানে, 'তাকে চোখ দাও' 'তাকে চোখ দাও' বলতে-বলতে সীমানাহীন ভয়ে তার চোখ ঢাকল দু-হাতে।

আজ তুমি, যে-তুমি অপমান আর বর্জনের নিত্য পাওয়া নিয়ে তবুও মুঠোয় ধরেছ আমাকে, আমাকেই, আমাকে

সেই তুমি আমার অন্ধ দু-চোখ খুলে দাও, যেন সইতে পারি এই পৃথুলা পৃথিবী, এই বিপুলা পৃথিবী, বিপুলা পৃথিবী···

সত্তা

তুমি থেকো, তুমি সবার দৃশ্যগোচর থেকো—
নইলে আমি এ যে কিছুই বুঝতে পারি না।
স্মরণ, বিস্মরণ—তার উর্ধ্বে প্রত্যেকে
দেখবে, তুমি মানবী না, স্বপ্নপরী না।

তবে কে ও? তবে কে ও? কোথায় চলেছে ও
অর্ধরাতে অন্ধকারে অবিশ্বাসিনী?
শব্দগুলি অন্ধকার, নীরব, নিঃশ্রেয়—
এখনো না, আমি সীমার প্রান্তে আসিনি।

তুমি থামো তুমি থামো, নিশীথে বন্যতা,
মধ্যে জাহাজ জলে হঠাৎ, তুমি থামো থামো,
দৃশ্যবিহীন অকূলতায় খোলে জলের জটা
গূঢ় পাতাল, মহাপাতাল, নমো নমো নম!

কিন্তু কেন? নিঃস্ব পদ্ম টানে প্রবল টানে
ভেসে কোথায় যেতে কোথায় ডাকে কে গো, কে গো
এ যদি হয় সত্তা তবে অস্তিত্বের মানে
থাকা, কেবল থাকা, তুমি বিশ্বগোচর থেকো।

মাতাল

আরো একটু মাতাল করে দাও।
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ও যে সইতে পারবে না!

এখনো যে ও যুবক আছে প্রভু!
এবার তবে প্রৌঢ় করে দাও
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ওকে বইতে পারবে না।

অন্তিম

আমায় বেছে-বেছে বরণ করেছিল
বিশ্ববিধাতার একটি দুরাশা।
এখন দেখছি তা কিছুই পূর্ণ না,
বয়স যদ্যপি মাত্র বিরাশি।

সফল কীর্তি তো আঙুলে গোনা যায়:
বসতিনির্মাণ, বংশরক্ষা;
তাছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে
সিঁদুরচিহ্নের মতন সখ্য!

কিন্তু সখাদের অস্থি ডাক দেয়
মস্ত সময়ের দাঁতের কৌটোয়—
প্রবল বহমান দু-ধারে গর্জিত,
অন্ধ নির্বোধ, টান দে বৈঠা।

পাগল

'এত কিসের গর্জে আকাশ
চিন্তা ভাবনা শরীরপাত?
বেঁচে থাকলেই বাঁচা সহজ,
মরলে মৃত্যু সুনির্ঘাত!'—

ব'লে, একটু চোখ মটকে,
তাকান মত্ত মহাশয়—
'ঈষৎ মাত্র গিলে নিলে
যা সওয়াবেন তাহাই সয়।

'হাওড়া ব্রিজের চুড়োয় উঠুন,
নিচে তাকান, উর্ধ্বে চান—
দুটোই মাত্র সম্প্রদায়
নির্বোধ আর বুদ্ধিমান।'

বুড়িরা জটলা করে

বুড়িরা জটলা করে
আগুনের পাড়ায়
দু-ধারে আঁধার জল
পাতাল নাড়ায়।

আবছায়া জাহাজ ঘিরে
মাতালের সাঁতার
কেউ-কেউ আলোক ভাবে
কেউ-কেউ আঁধার।

রাত্রির কুণ্ডলীও
কুয়াশায় কাঁপে
বুড়িদের জটলা নড়ে
অতীতের ভাপে।

বুড়িরা জটলা করে
বুড়িরা জটলা করে

পোকা

খেয়ে যা, খেয়ে যা, খা
দেয়ালের মধ্য খুঁড়ে জল।
বাহিরে ভরসা ছিল এতকাল শাদা
কোথা হতে নীলাভ গরল –
দেয়ালের মধ্যবুকে জল।

জালের জানালা খোলা, গগনে তাকা –
টিপি-টিপি পাহাড়-চূড়ালি।
যা, যা, নিজে যদি জুড়া তো জুড়া লি।
নতুবা আকাশে দিয়ে ছাই
দেয়ালে-দেয়ালে নড়ে পোকা।

যা, দেয়ালে-দেয়ালে ঘুরে যা –
খা, খা
খুঁড়ে-খুঁড়ে সবই অস্থায়ী
খেয়ে যা, খেয়ে যা, খা।

প্রতিশ্রুতি

এখন আমি অনেকদিন তোমার মুখে তাকাব না,
প্রতিশ্রুতি ছিল, তুমি রাখোনি কোনো কথা।
এখন ওরা অনেকদিন আমার মুখে তাকাবে না,
প্রতিশ্রুতি ছিল, আমি ভেঙেছি নীরবতা।

কেন ? কারণ সেই যে বুড়ি, সেই যে তিনটে পাকা বুড়ি,
ঘরের সামনে অশথ ঘিরে ঘুরেছে সাতবার,

বাঁধা মুঠি খোলা দু-গাল ধুলোতে আর শাপশাপাস্তে
ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে ঘর-বার।

বুকের ভিতর খরদীপালি জ্বালিয়ে বলে 'তালি, তালি'
দু-হাতে তালি, ছ-হাতে তালি, শ-হাতে তালি বাজে :
এখন আমি আর কি নারী তোমার মুখে তাকাতে পারি ?
কিংবা ওরা আমার মুখের গমক-গমক আঁচে ?

কেবল দু-জন দু-ধার থেকে মধ্যে আগুন আড়াল রেখে
খুলে দিয়েছি ছাইয়ের করতল,
গলিত দ্রব নীরবতা যদিও জানে শেষ পরিণাম—
তুমিও জানো, আমিও জানি, সামান্য সম্বল !

কিউ

একটু এগোও একটু এগোও
তখন থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি একটু এগোও
হে সর্পিণী, পিচ্ছিলতা একটু নড়ুক-চড়ুক !
মানুষ, মাছি, অন্ধকার   মানুষ, মাছি, অন্ধকার
হে সর্পিণী, পিচ্ছিলতা একটু নড়ুক-চড়ুক।

জলের সঙ্গে স্রোতের সামনে
মুখের দঙ্গে আলোর সামনে
মানুষ মাছি অন্ধকার একটু নড়ুক-চড়ুক,

একটু এগোও, বিসর্পিণী, একটু এগোও···

আয়না

আয়নায় আমার মুখ ?   দু-আনার উদ্‌গ্রীব সেলুনে
আয়নায় আমার মুখ ?   করোটি পর্যন্ত দেখা যায়।
পাড়ার ছেলেরা তবে ঐ যা নিয়ে ডুগডুগি বাজায়
সেও কি আমার মুখ ?   তবে কেন আগেই এ'লি নে ?
এখন জড়িয়ে দিলি বহুজনে মোছানো তোয়ালে -
সামনের উদ্যত ক্ষুরে নাচে যেন চিকন চিৎকার।
এই তো এলাম, আর এখনই সে জীবনরিক্তার
ঘরে যেতে ইচ্ছে নেই, আলো পড়ে প্রকট চোয়ালে।

বৃষ্টি যেন বৃষ্টি যেন, বৃষ্টি হলো মুখের জমিতে।
ভালোই, ধুইয়ে দাও, কিন্তু ওকে কত আর ধোবে ?
দু-আনার বেশি নয়।   তাও যদি ব্যস্ততায় লোভে
আরো একটু কাদা জমে এলোমেলো রেখার গণিতে—
তবুও আমার মুখ— আয়নায় আমার মুখই তবু ?
তবে ও-বর্বর কাচ এখনই চুরমার করো প্রভু !

মুহূর্তের মুখ

এক মুহূর্তের সঙ্গে অন্য মুহূর্তের কোনো আত্মীয়তা নেই ?
জলেস্থলে আত্মীয়তা নেই ?
যোজনবিস্তার মধ্যে ব্যবধান, ব্যবধান নিঃশব্দ তারায় প্রেক্ষাপট
অসীম ছড়ায় শূন্যে শঠ
প্রতি মুহূর্তের কণ্ঠ ছিঁড়ে নেয় অন্ধকারে পর্বতকন্দরে মহাকাল
কারণবিহীন এক মহাপরিণাম ভেসে চলে যায় গভীর সাগরে।

যে-প্রভাতে ছিলে তুমি ঘরে
তোমার মুখের চেয়ে শ্যামলতা ছিল না ভুবনে।
এক মুহূর্তের পরে আরেক মুহূর্ত পরে মুহূর্তে আরেক,
মুহূর্তে মুহূর্ত জমে স্তূপ শবাকার—
তারও পরে ঘুরে গেলে পাহাড়ি লতার ঝাড়
খোলে দ্বার অচেনা গুহার!

কে কোথায় আছি কে বা জানে!
তোমার মুখের চেয়ে বিশালতা ছিল না ভুবনে।
কে কোথায় আছি কার অস্তিত্বের মধ্যে কিছু ঘটে গেল কিনা
আকাশমর্ত্যের মধ্যে অকস্মাৎ শব্দময়ী ঝঞ্ঝা করে চলে গেল কিনা
কে বা জানে!
এক মুহূর্তের লগ্ন অন্য মুহূর্তের সন্ধানে
পাহাড়চূড়ায় ব্যর্থ দেখে তিনটি অন্ধ লোল জরতী প্রবীণা
দেখে এক কারণবিহীন মহাপরিণাম ভেসে চলে যায়,
দেখে আর অস্ফুট শুকানো স্বর বুনে-বুনে, বুনে-বুনে ত্রিবলীরেখায়
ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে আমাদের দিকে, আর
বলে, ঐ শিশুদের জামা।

কিন্তু এই শিশু আর বড়ো হয়ে অন্য কারো মুখে তাকাবে না।
তাদের নিজের সঙ্গে শৈশবের আত্মীয়তা নেই,
চোখে-চোখে আত্মীয়তা নেই,
জলেস্থলে আত্মীয়তা নেই,
কোনো আত্মীয়তা নেই এক মুহূর্তের সঙ্গে আর কোনো ছিন্ন মুহূর্তের
কারণবিহীন এক মহাপরিণাম ভেসে যায়, ভেসে চলে যায়—

তবে কেন একদিন ও এত জীবন্ত হয়ে ছিল?

ডানার শব্দ

সবাই প্রস্তুত আছো ? থুত্থুড়ি শাখার ফাঁপা বুকে
শব্দ হয়, শ্বাস ফেলে উড়ে যায় পাখি।
সবাই প্রস্তুত আছো ? গমগম গমগম ছায়া
সবদিকে ঘন রাত। এসো, হাতে হাত রাখো। ও কে
চলে গেল যেন ? এক দুই তিন চার গুনে রাখি, সব গুনে রাখি,
এসো, হাতে হাত রাখো। সবাই প্রস্তুত থাকো পতিপুত্রজায়া
সবাই। কেউ কি দূরে চলে গেল আমাদের ফেলে ?
কারো মুখ দেখা যায় না, ওরে তোরা সব ছেলে
ছুটে চলে আয়, ওরে আয়, এই পাহাড়ের নিচে
পুরোনো গাছের গুঁড়ি, রাত বড়ো ঘন হয়ে এল, চলে আয়।
ঝর্ঝর ডানার শব্দ। ঈশ্বর ঈশ্বর
বলে কেউ ডাক দিল। দ্রুত নেচে
ঝুমঝুম ঝুমঝুম যেন চলে আসে কারা, দাও, সব হাত দাও হাতে।
সকলের কণ্ঠ হতে চলে যায় স্বর,
আকাশে পাহাড়ে স্বর ঘুম হয়ে লেগে থাকে যেন মাঝরাতে
যেন আমাদের মধ্যে চুপ করে চলে যাবে কেউ সাবধানে
যেন কেউ চলে যাবে, যেন যাবে, শাখায়-শাখায়
নড়েচড়ে উড়ে যায় পাখি, উড়ে যায়, উড়ে চলে যায়।

শুধু এই ভূমিটুকু, মনে রেখো আর নেই, আর কিছু নেই কোনোখানে !

বাস্তু

আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না,
কলকাতায় থাকে।
আমার মেয়েকে ওরা চুরি করে নিয়েছিল

জবার পোশাকে!
কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?

শুধু ঐ যুবকের মুখখানি মনে পড়ে ম্লান,
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ও কেন গলির কানা বাঁকে
এখনো প্রতীক্ষা করে তাকে!

সব আজ কলকাতায়, কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?

ভিড়

'ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?
'সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান—'

আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে!
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে?

রাস্তা

'রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন।
মশাই দেখছি ভীষণ শৌখিন—'

চশমা ধরে নেমে এলাম
ঘুরতে ঘুরতে নেমে এলাম

ভুবনখানা টলে পড়ল ভুবনডিঙির পায়ে
ফিরে যাব, ফিরে যাব, ফিরব কী উপায়ে ?

এক রাস্তা দুই রাস্তা তিন রাস্তা কেউ রাস্তা
রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন।
তিন রাস্তা চার রাস্তা সব রাস্তা সমান
রাস্তা করে নিন।
এক রাস্তা দুই রাস্তা
দুই রাস্তা এক রাস্তা
কেউ রাস্তা দেবে না, রাস্তা করে নিন।

শাদা দেয়াল

শাদা দেয়ালের গায়ে অন্ধকারে কালো তিনটে ছায়া
অস্পষ্ট ঘুমের মধ্যে। তিনটে কেন ? দরোজা খুলো না
ডুব দিয়ে দেখেছি খুব, বাইরের হাওয়ায় শুধু লোনা,
রাত্রি বড়ো ভয়ানক। পাশের বাড়ির বুড়ি আয়া
একটু আগে মারা গেছে। তিনটে কেন, আমি তো উঠিনি ?
বুড়ির মুখের মধ্যে লীন সেই গম্ভীর নিশ্বাস
শুনতে পাচ্ছ ? এখনো না, দরোজা খুলো না। একটি মাছ
অস্পষ্ট ঘুমের মধ্যে হেসে উঠেছিল একাকিনী।

শাদা দেয়ালের গায়ে অন্ধকারে কালো তিনটে মুখ
আস্তে-আস্তে নেমে আসে। একলা চুপ করে শুয়ে থাকো
অনেক জলের মধ্যে। বুড়ি গেল ? বুড়ি গেল ? যাক ও—
ওধারে জানালা বন্ধ করে দাও, হাওয়ারও অসুখ !
কেবল বাদুড় ডাকবে, রাত্রি বড়ো ভয়ানক ছায়া,
মধ্যে মাত্র দেয়ালের ব্যবধানে কাকে দেখে আয়া ?

অলস জল

পা-ডোবানো অলস জল, এখন আমায় মনে পড়ে ?
কোথায় চলে গিয়েছিলাম ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা ?

খুব মনে নেই আকাশ-বাতাস ঠিক কতটা বাংলাদেশের
কতটা তার মিথ্যে ছিল বুকের ভিতর বানিয়ে-তোলা :

নীলনীলিমা ললাট এমন আজলকাজল অন্ধকারে
ঘনবিনুনি শূন্যতা তাও বৃক্ষ ইব চতুর্ধারে !

কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম ? মাঝি, আমার বাংলাদেশের
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই

শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ, সেই

স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হাতের খেলা,
তোমায় আমি বুকের ভিতর নিইনি কেন রাত্রিবেলা ?

ফুলবাজার

পদ্ম তোর মনে পড়ে খালযমুনার এপার-ওপার
রহস্যনীল গাছের বিষাদ কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ?

স্পষ্ট নৌকো, ছই ছিল না, ভাঙাবৈঠা গ্রাম-হারানো
বস্ত মুঠোয় ডাগর সাহস, ফলফুলন্ত নির্জনতা

আড়ালবাঁকে কিশোরী চাল, ছিটকে সরে মুখের জ্যোতি

আমরা ভেবেছিলাম এরই নাম বুঝি বা জন্মজীবন।

কিন্তু এখন তোর মুখে কী মৃণালবিহীন কাগজ-আভা
সেদিন যখন হেসেছিলি সত্যি মুখের ঢেউ ছিল না!

আমিই আমার নিজের হাতে রঙিন করে দিয়েছিলাম
ছলছলানো মুখোশমালা, সে কথা তুই ভালোই জানিস—

তবু কি তোর ইচ্ছে করে আলগা খোলা শ্যামবাজারে
সবার হাতে ঘুরতে-ঘুরতে বিন্দু-বিন্দু জীবনযাপন?

বৈধাবৈধ

ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললে সবাই আমার বিচার করে।
সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছি এখন আমার এই সম্বল
হাতঘড়িও কাল সকালে নিয়ে নিয়েছে উল্টোডাঙা।

ও কি মজা করছে ভাবো?   ও যে চোখে দেখতে পায় না!
তোমরা তো সব দেখতে পাচ্ছ, বরং আমায় ধরতে পারো
দাও ছেড়ে দাও ওকে, ওকে ছাড়লে তবে দেখতে পাবে।

এখন আমি যেখানে যাই ওকেই সঙ্গে নিয়ে ফিরি
কিন্তু তোমরা এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে হামলা করো
ভিড়ের মধ্যে বৈধাবৈধ বিচারও নেই, জাপটে ধরো

কিন্তু ও যে দেখতে পায় না তা অন্তত স্বীকার করো!

চাবুক

চাবুক-চাবুক সমস্ত দিন চাবুক
যাত্রী উঠুক যাত্রী চলুক নাবুক
ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছন চাবুক

তুই কে যে তুই আড়নয়নে হেরিস
পরখ করিস মিথ্যে মেকি বেড়ি
ঘরসংসার নারীপুরুষ হেরিস

কদম কদম রেড রোডে ধা কদম
পাঁজর ভ'রে মধ্যম এবং অধম
ছায়াপথের উল্কা ছুটিস কদম

ঝমর্ ঝমর্ ঝমৎ ঝমৎ ঝমাস্
বছর বছর ক'রাত ক'দিন ক'মাস
সামনে কদম চাবুক হেরিস্ ঝমাস্

চাবুক চাবুক সমস্ত দিন চাবুক
যাত্রী উঠুক যাত্রী চলুক নাবুক···

পিঁপড়ে

পিঁপড়ে রে, তোর পাখা উঠুক
আমি যে আর সইতে পারি না !
সারিবন্দী সারিবন্দী সারিবন্দী মুখ
আমি যে আর দেখতে পারি না।

আলমারিতে খাবার আছে, কিন্তু সে তো আমার জন্য রাখা,
তুই কেন তা খাস ?   বিশ্রী বদভ্যাস !
আলমারি, প্লেট, বারান্দা, বই, উজাড় টেবিলঢাকা,
গভীর রাতের বিছানাটাও চাস্ ?

পিঁপড়ে রে, তোর বাসা কোথায় ?   উড়িয়ে দিয়ে পাখা
সেইখানে যা, নয়,
ঝাঁপ দে যমুনায়,
নইলে মস্ত আগুন জ্বেলে চতুর্ধারে নাচ্,—
পাখা উঠুক পাখা উঠুক পাখা উঠুক তোর
পিঁপড়ে রে, আর সইতে পারি না ।

সজ্ঘ

এক দশকে সজ্ঘ ভেঙে যায়   থাকে শুধু পরিত্রাণহীন
ব্যক্তির আবর্তে ঘূর্ণিঘোর,   কার শির ছেঁড়ে সুদর্শন ?
'মিথ্যাচারী মিথ্যাভাষী, শঠ, আমিই মহান্, দেখ্, আমাকে'—
ছিন্ন হয়ে যায় শিশুপাল   এক দশকে সজ্ঘ ভেঙে যায় !

কিন্তু ব্যভিচার, রক্তধারা   লক্ষ-লক্ষ জীবন্ত বীজাণু
মুক্তি পায় চক্র ছুঁয়ে যায়— ঘোরে চাকা দশক দশক ।
আরো শত নিষ্ঠুরতা বাকি,   সে কেবল স্থির প্রচালিত
শোকের দ্বেষের পরিপাকে   গড়ে তোলে অদ্বেষ অশোক !

ঘর

কখনো মনে হয় তুমি ধানখেতে ঢেউ, তারই সুগন্ধে গভীর তোমায়
উদাত্ত-অনুদাত্তে বাঁধা দেহ, প্রসারিত, হিল্লোলিত
আমি ডুবে যাই নিবিড়ে নিমগ্ন বৃষ্টিরেণুর মতো, শিউরে ওঠে সমস্ত পর্ণকণা
জীবনের রোমাঞ্চে, ধূপের ধোঁয়ার মতো মাটির শরীর জাগে কুণ্ডলিত
কুয়াশায়
তারই কেন্দ্রে তুমি, তুমি প্রসারিত, হিল্লোলিত, প্রসারিত।
আজ মনে হয় কী ক্ষমাহীন রাতগুলি বেঁধেছিল আমায়। বাইরে তার
সজল মেঘাবরণ, দেখে ভুললে, ভুলে কামনার দুই ঠোঁটে টেনে নিলে বুকের
উপর বারে-বারে, ঘুলিয়ে উঠল অন্তরাত্মা
কিন্তু কাছে এসে দেখলে, হায়, এ কী ভগ্নকরুণ অবনত দয়িত আমার!
এই কি সে দিব্যসজল মুখশ্রীর যৌবন যাকে আমি মগ্ন আকাশের অসংখ্য
তারার মতো চুম্বনকণিকায় ভরে দিতে পারতুম, হায়
ব'লে উদ্বেল হলো করুণা তোমার দুই বুকে, যুগল নিশ্বাস প্রবাহিত হলো
ধানখেতের উপর তোমারই সংহত শরীরের মতো, দূরে
আর তার নিপীড়ন দেহ ভরে আস্বাদ করে আস্তে-আস্তে উন্মোচিত হতে
থাকে আমার সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত অন্ধকার!

যে-ঘর ছেড়ে

তখন ছিল ঘরে, কিংবা ঘরের লগ্ন বারান্দায়
প্রতীক্ষার বয়স,
তখনও ছিল বেলা, ছিল আলোক-নেভা আভাস
চোখের কোণে ভীরু,

সামনে বাঁকা অগণিত গাছের গূঢ় সমারোহে
বুকে রুদ্ধ বাতাস,
পায়ের ভিতর অসুখ নিয়ে পাখিরা সব ঘুমিয়ে গেছে
নিঃঝুমতা খোলা—
ক্রমেই আরো থাকতে হবে, ফিরে আসবে, থাকতে হবে
তখন অনেকক্ষণ
পিছন দিকে ঘর, আর ঘরের লগ্ন বারান্দায়
বিনত পিঠ, ঘুম,
ফিরে আসবে ঘুরে আসবে সমস্ত দিন সমস্ত রাত
সমস্ত রাজপথ
একই দরজা দিয়ে ঢুকবে, যেমন আলগা ঢুকেছে কাল
অমত্থপ মাতাল—
মুখে ডানার রূপক দেখে, বলয়ভরা পালক দেখে
চেঁচিয়ে উঠবে—'হায়
কাল যে-ঘরে ছিলাম, আমি যে-ঘর ছেড়ে গিয়েছিলাম
কোথায় সেই ঘর?'

পরাভব

তবে এই পরাভবে প্রতিরাতে আমাদের ঘরের সুন্দর
বেঁচে ওঠে?
তবে এই পরাভব পায়ে নিয়ে এতদিন এ-ঘর ও-ঘর
ঘুরে গেছি?
প্রতি রবিবার তুমি নিজের মনের মতো
সাজিয়েছ বাড়ি,
আরো কত দেরি আছে ভেবেছ আলতো ঠোঁটে গুনগুন গান
শুধু আমি কোনোদিন সময়ে ফিরি না
ঘর জুড়ে বেজে ওঠে টান,
আমার নিহত মুখ রাজপথে বলে দেয় সুন্দর কিসের প্রতিমান।

জল

জল কি তোমার কোনো ব্যথা বোঝে?   তবে কেন, তবে কেন
জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে?
জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয়?   তবে কেন, তবে কেন
কেন ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার?

ইট

নষ্ট হয়ে যায় প্রভু, নষ্ট হয়ে যায়!
ছিল, নেই—মাত্র এই; ইটের পাঁজায়
আগুন জ্বালায় রাত্রে দারুণ জ্বালায়
আর সব ধ্যান ধান নষ্ট হয়ে যায়।

বাড়ি

আমি একটি বাড়ি খুঁজছি বহুদিন—
মনে-মনে।
আলোর তরল জলে ভেসে যাব কবে!

বাড়ি কি পেয়েছ তুমি?

বাড়ি তো পেয়েছি আমি বহুদিন—
মনে-মনে,
বাড়ি চাই বাহির-ভুবনে।

ঘর : ১

তোমরা যদি কথা বলতে চাও—
এসো আমার ঘরে, আমি ঘর পেয়েছি,
এসো,
আমার ঘরে উদ্যত বন্ধুতা।

তোমরা যদি ছায়া শুনতে চাও—
এসো আমার ঘরে, আমার মুখের উপর আলো
পিছ-দুয়ারে ছায়া খরস্রোতা।

কিংবা যদি বাহিরই চাও, এসো এসো এসো
নীল পাথরে হাঁটি ·

সেই মুহূর্তে নিভে গেল ঘরে সকল বাতি।

ঘর : ২

যে চায় তাকে আনিস
যে যায় তাকে আনিস
যে চায় তাকে আনিস ডেকে আনিস—
ঘরের কাছে আছে অনেক মানুষ।

যে যায় দূরে অনেক দূরে অনেক দূরে-দূরে
অনেক ঘুরে-ঘুরে
যে যায় তাকে আনিস ডেকে আনিস ঘরে আনিস
ঘরের কাছে আছে ঘরের মানুষ!

দু-জন যেতে উজান পথে উজান যেতে-যেতে
ঘরের মুখে আগুন কেন জ্বালিস ?

আধখানা মুখ

আধখানা মুখ বাইরে রেখো, আধখানা মুখ অন্ধকারে,
দূর থেকে যেন সবাই তোমায় দেখতে পারে।

ঘুম যদি পায় রাত্রিবেলা, শীতের জটিল অন্ধকারে,
জ্বেলে নিয়ো তাপ উড়কি পাতায়, শুকনো খড়ে।

দূর থেকে তাপ দেখতে পাব, আগুনের জ্বালা অন্ধকারে,
হঠাৎ পথে কী দস্যুতা রে !

কেড়ে নিয়ে যায় ঝরনার মতো ছুটে চলে যায় অন্ধকারে
নিয়ে যায় সব অস্থি-মজ্জা-মাংস কেড়ে।

এখন ওদের সঙ্গে যাব, ভীষণ তরল অন্ধকারে
অস্তিত্বের কিনারপাড়ে।

আধখানা মুখ বাইরে রেখো, আধখানা মুখ গোপন ঘরে
গলে পড়ে যায়, গলে পড়ে যায়, ঝরে পড়ে যায় অন্ধকারে।

মধ্যরাত

আজ আর কেউ নেই, ঘুমন্ত ঘরের নীল জল,
ঠাণ্ডা বারান্দার গায়ে মধ্যরাত দেবতার দীপে—
হাতে খেলে যায় হাওয়া।

আজ চুপ করে ভাবো, এই রাত মৃত্যুজলঢেউ,
বড়ো একাকিনী গাছ, মাঝে-মাঝে কার কাছে যাব,
ঘুমায় ঘরের গায়ে ছায়াময় বাহিত প্রপাত,
বুকে খেলে যায় হাওয়া।

দুইজনে পাশাপাশি, মাঝে কি পথিক নেই কোনো,
এখন বসন খোলো, দেবতা দেখুক দু-নয়নে,
শিশিরে পায়ের ধ্বনি সুদূরতা অধীর জলধি
শুধু বহে যায় হাওয়া।

আজ আর কেউ নেই, মাঝে-মাঝে কার কাছে যাব।

খাল

ভাঙা নৌকো পড়ে আছে খালের কিনারভরা
এখন সন্ধ্যার শত নাম ;
তুমি আমি মুখোমুখি নই আর।
অবসাদ দিয়েছিলে মনে পড়ে, শুধু মনে পড়ে না কখন
অপরের হাত ধরে চলে গেছ নদীর জোয়ারে।

চারিদিকে সব জল ঠিক আছে নীরবতাময়।
মাঝে-মাঝে যেন কোনো হঠাৎ শুশুক

ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যায় ব্যবহৃত সময়ের টান—
আমি যার নাম জানি সে কি জানে আমার হৃদয় ?

খাল থেকে ছোটো খাল
আরো ছোটো ছোটো সব খালের ভিতরে
কিছু আর মুখোমুখি নয়
আড়ালে অদৃশ্য জালে ঢাকা আছে বীজাণুর কাল—
এখন নদীর দিকে ভালোবাসা প্রতিহত হয়।

বৃষ্টি

আমার দুঃখের দিন তথাগত
আমার সুখের দিন ভাসমান !
এমন বৃষ্টির দিন পথে-পথে
আমার মৃত্যুর দিন মনে পড়ে।

আবার সুখের মাঠ জলভরা
আবার দুঃখের ধান ভরে যায় !
এমন বৃষ্টির দিন মনে পড়ে
আমার জন্মের কোনো শেষ নেই।

মুনিয়া

মুনিয়া সমস্ত দিন বাঁধা ছিল।

খুব বারোটায় উঠে চুপি চুপি খাঁচা খুলে

'উড়ে যা' 'উড়ে যা' বলে প্ররোচনা দিতে
আমার বুকের দিকে তুলে দিল ঠ্যাঙ—

জ্যোৎস্নায় মনে হলো বাঘিনীর থাবা।

দুপুরের পাখি

একটিমাত্র পথ। সেই পথে সে এসেছিল।
এবং একটি তরুণ পাখি আলোর চূড়ায় বসেছিল
ঐ বাড়িটির উপর।
নিচে দুয়াব ঝম্পাল হলো দাপাদাপির দুপুর
উড়াল দিল পাখি!

ঘরের দরজা খুলে গেল
দুপুরে সব দূরে গেল
                উড়াল দিল পাখি।

যেন কোনোদিন

যেন এই পৃথিবীতে কেউ কোনোদিন
প্রেম বলে কোনো ঋণ রাখেনি কোথাও,
যেন কেউ কোনোদিন কিশোর শিশির
বুকে নিয়ে পুবসাগরের নীল পাড়ে
দেখেনি প্রথম নারী যেন কোনোদিন।
নারী, যে চোখের কোণ হ্রদতটমূলে
ভাসায় দু-ধার, যেন কেউ কোনোদিন

তার মুখ রেখে দিয়ে আসেনি কখনো
গাঢ়তল ভুবনের গহন শিলায় !
যেন শুধু জলস্তম্ভে ছুটে যায় ফুল
ঘট ভেঙে ভেসে যায় সিঁদুরের নাম
আবর্ত বাজায় বুকে বুকে খর তালি—
যেন কেউ কোনোদিন এমন নীরব
পল্লবের মতো নত প্রেমিক ছিল না !

ঘেরা-জাল

আস্তে আস্তে ছোটো হয়ে আসে
আরো ছোটো হয়ে আসে ঘেরা-জাল, জালের মশারি,
কিছু-কিছু নিতান্ত উড়ন্ত রাতে ভরা চাঁদ
ঢেউ দিয়ে তুলে নিয়ে যায় মেঘে উদাসীন শাড়ি,
ভিতরে বাহির-জালে ঝিরিঝিরি অতীতের ধারাপাত,
মধ্যবর্তী প্রেতকুল সেই মুহূর্তে চোখে-চোখে কানে-কানে
সব কথা বলে দিয়ে ত্রিযামের আগেই মিলায় : কে বা রাধা !

কিছু বা দিনের কাছে কিছু বা রাতের কাছে বাঁধা।

আলাপচারি

তুমি বলে গেলে আড়ালে অনেক কথা।
তারপরে যেই চলে গেলে ক্ষীণ আড়ালে—
এলেন আরেকজন,
বললেন, 'ওঃ, অমুকবাবুর কথা !

আমি যদি ফিরি ডালে-ডালে তবে
উনি তো পাতায়-পাতায়'
বলে তিনি যেতে গেলেন মহোৎসবে।

আর ঐ দূরে পথচারী, ও যে
একাকীর বৈভবে
দূরে চলে যায়, আরো চলে যায় সুপুরি-বনের সারি

রাঙামামিমার গৃহত্যাগ

ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপরে সাঁকো পেরিয়ে—

ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!

মধ্যাহ্নপুর

এখন আরো অপরিচয়
এখন আরো ভালো,
যা-কিছু যায় দুপুরে যায় উড়ে।

যেমন ছিল বাঁধাদিনের চতুঃসীমায় বাঁধা,
ঝিমায় ওরা ঝিমায়,
শহর, তার বুকের মধ্যে দীর্ঘ পুকুর, শোনে
দীর্ঘ পুকুর, খোলা আকাশ হা-হা,
পুরোনো সব রুপোর বাসন ছড়ানো অঙ্গনে।

দুপুরে যায়, দুপুরে যায়, ঝিমন্ত তন্দ্রে
নিভৃতে যায় খুঁড়ে—
কেবল যখন স্বপুরিচয় চয়ন করতে এসে
ওরা হঠাৎ নিজের মুখে ভেসে
সামনে দেখে পুকুর—

আমার চতুর্দিকে শহর, চতুর্দিকে আলো,
আমি তখন মধ্যদুপুরবেলা।

আমাদের ভালোবাসা

আপন আলোয় আমি নেমে আসি তোমার দক্ষিণে
যেমন সূর্যাস্ত এসে ঘিরে নেয় মন্দির, বটতলা
গ্রামান্তে মন্থর দিন নতজানু নদীর কিনারে
এই প্রেম, আমাদের ভালোবাসা।

যদি বলো ব্যক্তিগত, তবে তাই; এরই তো বীজের মধ্যে দশ দিক ঘুরে আসা
নিজেরই ধরনে আমি তাপ রেখে সবার দুহাতে
'ভালো আছো? বন্ধু, ভালো আছো?'
অনেকেই ভালো নেই, ফিরে চলে আসি সংগোপনে।

নির্জন মন্দির খোলা, পায়ে উড়ে পড়ে শীর্ণ পাতা
আমার অস্ফুট আভা অন্ধকার তোমার অন্দরে
সমস্ত আকাশ আজ তাপ রেখে গেছে ওই দেহে
এই প্রেম, আমাদের ভালোবাসা।

হাজারদুয়ারি

একবার তাকাবে না ? নিজের মুখের দিকে চোখ ভ'রে ?
মাঝে-মাঝে ফিরে দেখা ভালো নয় ?
তুমি হাত ধুতে পারো এত গঙ্গাজল জানে কোন্ দেশ !
মাঝে-মাঝে ধুয়ে নেওয়া ভালো নয় ?
তাই আমি আমার দক্ষিণ হাত
রেখেছি নিজের বুকে,
তুমি এসো, মাথা পাতো, যেন কত ঘর ঘুরে এলে
এখন লহরী নয়
যত চুপ তত দূর দুয়ারে দুয়ার খুলে যায়
দুয়ারে দুয়ার খুলে যায়
এই এক শুদ্ধতর
হাজারদুয়ারি ভালোবাসা।

যাব না সাগরে

একদিন দূরের বয়সে
ভেসে চলেছিলাম সাগরে।
মাসি, ছিলাম সাগরে।
তখন ঘরের কোন্ নিভৃত মা এসে
দিল এ গভীর অভিশাপ ?
জলে বড়ো চাপ, বড়ো চাপ,
দ্রুত জল লহরে লহরে।

মাসি, যাব না সাগরে।

পুরোনো খালের নিচে ঘন সবুজের স্রোত

নৌকো ভেসে যায়,
দিগন্তে দুয়ার খুলে মাঝে-মাঝে ভেসে যায়
কে যায় কে যায় ?
বিকেলের শান্ত পাল দেখেছে রাখাল,
দূর ঘরে কাঁপে ক্ষীণ ঠোঁট :
'আমরা কেউ নই, আমরা নই।'

মাসি, ওরা কেউ যাবে না সাগরে।

ছুটি

হয়তো এসেছিল। কিন্তু আমি দেখিনি।
এখন কি সে অনেক দূরে চলে গেছে ?
যাব যাব। যাব।

সব তো ঠিক করাই আছে। এখন কেবল বিদায় নেওয়া,
সবার দিকে চোখ,
যাবার বেলায় প্রণাম, প্রণাম।

কী নাম ?
আমার কোনো নাম তো নেই, নৌকো বাঁধা আছে দুটি,
দূরে সবাই জাল ফেলেছে সমুদ্রে—

ছুটি, প্রভু, ছুটি।

এখন সময় নয়

এই তো, রাত্রি এল। বলো, এখন তোমার কথা বলো।

কিন্তু বলবে কোন্ ভাষায়? না, এই পুরোনো ক্ষয়ে-যাওয়া কথা তোমার ঠোঁটে ধোরো না—সেই তোমার ঠোঁটে যাকে দেখেছিলুম মলিন মেঘের মতো ঝিমিয়ে থাকতে, কিংবা উথলে উঠতে ঝোড়ো রাতে পদ্মার মত্ত ভালোবাসায়, না—তোমার সেই ঠোঁটে তুলে নিয়ো না কত জন্মের এই ব্যবহৃত ভাষা, জীর্ণ, উচ্ছিষ্ট।

বলবে কোন্ ভাষায়? যে ভাষায় বাচাল প্রকৃতি চিৎকার করতে থাকে আমার চোখের সামনে, তার সব রঙ একত্রে এসে ঘুলিয়ে দেয় আমার আনন্দের স্বাদ, 'সরে যাও' 'সরে যাও' বলে দৌড়ে বেড়ায় অন্তরাত্মা, না, সেই দারুণ প্রকৃতির রহস্য তুমি তুলো না তোমার ঠোঁটে।

এই পৃথিবী না থাকলে থাকত শুধু অন্ধকার। কিছুই থাকত না এই সৌরলোক না থাকলে। কিন্তু কোথায় থাকত সেই না-থাকা, কোন্ পাত্রে? অন্তহীন এই নাস্তি যখন হা হা করে এগিয়ে আসে চোখের উপর, জ্বলে ওঠে রক্ত—তখন তুমি কথা বলো মহাশূন্যে অন্ধকারের ফুটে ওঠার মতন, সেই তোমার ভাষা হোক প্রথম আবির্ভাবের মতো শুচি, কুমারী—শস্পের মতো গহন, গম্ভীর

এই তো, এই তো রাত্রি হলো। বলো, এখন তুমি কথা বলো।

সময়

তোমরা এসেছ তাই তোমাদের বলি
এখনো সময় হয়নি।
একবার এর মুখে একবার অন্য মুখে তাকাবার এই সব প্রহসন
আমার ভালো লাগে না।
যেখানে আমার কবর হবে আজ সেখানে জল দিতে ভুলে গিয়েছি
যে সব শামুক তোমরা রেখে গিয়েছিলে
তার মধ্যে গাঢ় শঙ্খ কোথাও ছিল না
তোমরা এসেছ, তোমাদের বলি
গ্রহে-গ্রহে টানা আছে সময়বিহীন স্তব্ধ জাল
আমি চাই আরো কিছু নিজস্বতা অজ্ঞাত সময়।

ভিক্ষা

আর আমাদের এই কয় মুষ্টি ভিক্ষা দেবে প্রিয়।
আমি জানি তুমিও একদিন হবে বিশ্বাসঘাতক
রক্ত নেবে ছল করে বসে আছো—
সব জেনেশুনে তবু জানু পেতে দিই
তোমার নিজের হাতে ভিক্ষা নিতে এত ভালো লাগে।

নাম

কোনো জোর কোরো না আমায়।

শব্দগুলি খুলে যাক, খুলে-খুলে যায়
যেমন-বা ভোর

জলস্রোত বহুদূরে টেনে নিয়ে যেমন পাথর
জনহীন টলটল শব্দ করে

দিগন্তের ঘরে
আমাদের নাম মুছে যায় চুপচাপ।   খুব ক্ষীণ

টুপটুপ খুলে পড়ে ঘাসের মাথায় নীল, আর কোনো দিন
কোনো জোর কোরো না আমাকে।

এম্‌নি ভাষা

মনে কি ভাবো লাজুক, লজ্জাশীলা ?
এ-সব আমার অনেক হলো
    এখন
রাস্তা জুড়ে থমকে আছে ট্রামের সেতু
দীর্ঘ তবু অনিশ্চিত বৈদ্যুতিক।
কোথায় যাবে যাত্রীদল, যাত্রিণীদল, চক্‌ঝমকের যাত্রিণীদল ?
    এসো, আমার অল্প পায়ের সঙ্গে নামো।
মনে কি ভাবো লাজুক ?   আমার এম্‌নি ভাষা।

সহজ

আমিই সবার চেয়ে কম বুঝি, তাই
আচম্বিতে আমার বাঁ-পাশে এসে হেসে
পিঠ ছুঁয়ে চলে যাও ;
'অত কি সহজ ?'   বলো তুমি।

তার পর আমার কী বাকি থাকে ? অপরাধ
আমার দু-পাশে কেন কাশফুল হয়ে ভরে ওঠে ?
শরীরে শারদবেলা নত হয়ে নেমে আসে যেন-বা আমিই শস্যভূমি
অত যে সহজ নয় মাঝে-মাঝে তাও ভুলে যাই ।

ঘুম

যখন আকাশ ধুইয়ে দিল মাটির মুখ রাত্রিবেলার অন্ধকারে
আমরা কেউ জানতুম না, আমরা ঘুমিয়েছিলুম ।

ঘাসগুলো যখন নাচে মেতেছিল এ ওর কোমর জড়িয়ে
আমরা কেউ জানতুম না, আমরা ঘুমিয়েছিলুম ।

আমাদের সেই গভীর ঘুমের মাঝখানে বৃষ্টি নামেনি—
আমরাও নামিনি বৃষ্টির মাঝখানে । তবু কেমন করে
কেটে গেল রাত্রির নির্জন থমথম
আর অলস মন্থর সকাল
কেমন করে ভেসে উঠল চোখের উপর—

আমরা কেউ জানলুম না, আমরা ঘুমিয়েছিলুম ।

প্রতীক্ষা

কড়িকাঠ থেকে বুকের রক্ত পর্যন্ত ঝুলে-পড়া মাকড়সা
অনেকদিন পরে ঢুকতে গেলে জাল জড়িয়ে ধরে মাথায়,
বলে—এসো এসো, এই তো কত গ্রীষ্ম বর্ষা

কত শীত হেমন্ত বসে আছি তোমার প্রতীক্ষায়, এসো—
ব'লে ভিজে অন্ধকারে মনোহীনতার গন্ধে টেনে নিতে-নিতে
শুষে নেয় আমার সমস্ত উদ্ভিদ, আমার অন্তরাত্মা।

প্রতিহিংসা

যুবতী কিছু জানে না, শুধু
প্রেমের কথা ব'লে
দেহ আমার সাজিয়েছিল
প্রাচীন বল্কলে।

আমিও পরিবর্তে তার
রেখেছি সব কথা :
শরীর ভরে ঢেলে দিয়েছি
আগুন, প্রবণতা।

গুল্ম, ঈথার

আমি যখন নিচু হয়ে পাথরকুচি কুড়াই
কয়েকটা জটিল গুল্মের ছায়া পড়ে আমার মুখে
আড়াআড়ি।

আর যখন শূন্যমুখে উল্টোমুখে আকাশে তুলে দিই হাত
মুখের কিনার ঘিরে ঢেউ দেয় জয়ন্ত ঈথার আভাময়
অদৃশ্যতা।

'ও এমন একই সঙ্গে দু-রকম কেন ?'—ওরা ভাবে।

জাবাল

সকলেই ভুল কথা বলে, আমি তাই
কারো কথা শুনি না কখনো।
যেমন সেদিন হলো : 'এ গলিতে যাওয়া যাবে ?'
বলতেই ক-জন বেশ নিরুদ্‌বেগ লোক
বলে দিল, হ্যাঁ, এই-ই পথ, চলে যান সোজা—

ভিতরে শাবল হাতে ছিল এক পাড়ার বালক।

যত দেরি হোক
জবালা, যাবার পথ আমাকেই খুঁজে নিতে হবে

নিজের আয়না

আমি দশদিকে চাই, আমার অসুখ ছিল সারাদিন
এখন বাহিরবেলা, শুষ্ক হাতে দাঁড়িয়েছ তুমি।

আমার কি দেনা ছিল ? আমি তো অনেকদিন দায়হীন—
শরীরে অঘ্রান আর সারাবেলা ঝরে বনভূমি।

গোধূলিশহর তুমি খুলে নাও জরিসুতো, ছাড়ো টান
আমার দু-চোখে নীল ধরেছি ভিক্ষার বাটি, জল

ক্ষতমুকুরের ছায়া কিছু-কিছু দিঘিভরা অবসান
এখন আমার পথে পথিকজটিল পদতল।

আমি দশদিকে যাই, আমার অসুখ পায়ে বাসা বাঁধে
এতদূর দীর্ঘ স্নেহ, আমারই কি তবে কোনো দায় ?

কিছুই জানি না ঠিক কতদূর যাওয়া যাবে অবসাদে
কত প্রতিহত পথ আমার নিজের আয়নায় !

দ্বা সুপর্ণা

'কেমন করে পারো এমন স্বাভাবিক আর স্বাদু আহার
সব জায়গায় মানিয়ে যাও কিছুই তোমার নিজস্ব নয়
কেমন করে পারো ?
নষ্ট তুমি নষ্ট তোমার আলগা শোভা বুকের বাহার
সমস্ত ফল ঠোঁটে জ্বালাও সবার সঙ্গে সমান প্রণয়
কেমন করে পারো ?'

'নষ্ট আমি কিছুই আমার নিজস্ব নয় ; ডালে-ডালে
পাতায়-পাতায় স্বাদু আহার বিষ অথবা বাঁচার আগুন
ধরে ব্যাপক মাটি—
দীর্ঘতর বট, এমন জটিলঝুরি সমকালীন
সব জায়গায় থাকি, আমার
অন্য একটি পাখি কেবল আড়াল করে রাখি।'

চরিত্র

এক পাথরে বসে থাকার অনন্ততা হয়তো ভালো।
তোমাকে সব দেখতে পায়, তুমিও সব দেখতে পাও

মুখের সঙ্গে মুখের ছায়া স্থির ছবিতে নিসর্গ, তা-ও
হয়তো ভালো। সত্যি ভালো ?

নাকি পাথর থেকে পাথর টপকে চলার যখন-তখন ?
পাহাড়পায়ে প্রণত পথ
অল্প নিচে বুকের জমি ভরে যাবার উড়ন-নদী
স্বচ্ছ এবং নগ্ন তরল

টপকে চলা, নিসর্গপট ওলটপালট মুখের আড়ে
নীলসবুজে লড়াই সারে
পিছনে চুল মেঘলা ওড়ে, নবীন শরীর চলচ্ছবি
পাথর থেকে পাথরে যায় ঐ যুবতী, জীবনসমান
সেই যাওয়া কি চরিত্র নয় ?
আরেক রকম চরিত্রবান।

এ খেলার আরেক নিয়ম

যতই এগিয়ে আনো আমি আরো পিছে সরে আসি
এই খুব খেলা,
মাটিতে মিশাব বলে আসিনি মাটিতে।

তুমি ভাবো পরাভূত ? কিসের নিয়মে পরাভব ?
এ খেলার আরেক নিয়ম।

যতই এগিয়ে আনো আমি আরো মুঠো করে সব
নিজের ভিতের দিকে টান দিই—

তারপর মুখোমুখি একাকীর নিরেট গলিতে
দেখা যাবে মরণের বেলা।

যখন প্রহর শান্ত

যখন প্রহর শান্ত, মধ্যম, নিবিড় আভাসিনী
সমস্ত ব্যসন কাম উজ্জ্বলতা ঘুমিয়ে পড়েছে
বাহির-দুয়ারে চাবি, আমি নতজানু একা
আমার নিজের কাছে ক্ষমা চাই, পরিত্রাণ, প্রতিটি শব্দের শাস্তি—
বধির দিনের যাত্রী :
কর্মে ছিল অধিকার, আমাকে কি সমর্পণ সাজে ?

চাবি

জাল করেছে জাল করেছে ওরা আমার সই
জাল করেছে—ব'লে যেমন ধরতে গেলাম চোর
ঘুরিয়ে দিয়ে মুখ
দেখি, এ কী, এ তো আমিই, আমিই দুঃসাহসে
জাল করেছি জাল করেছি, হা রে আমার সই
জাল করেছি আমি আমার সর্বনাশের চাবি !

আড়াল

আমি আড়াল চেয়েছিলাম চার কিনারে।
কিন্তু প্রভু ভুল কোরো না
রাত্রিসকাল
পথই আমার পথের আড়াল।

দু-হাত তোমায় বাড়িয়ে দিইনি সে কি কেবল আত্মাভিমান ?

যখন মুঠো খুলতে গেছি হাতের রেখায় দীনাতিদীন
কাল রজনীর নিষ্ফলতা চাবুক মারে।

এখনো ঠিক সময় তো নয়, শরীর আমার জন্মজামিন
পথিক জনস্রোতের টান
তার ভিতরে এমন উজান
আমি আড়াল চেয়েছিলাম পিছনদাঁড়ে।

যাবার মতো নই

এখন যাব না অন্য গ্রামে, এখন দুপুরবেলা, দুপুরে ধুলোর পথে
যেতে গেলে টেনে নেয় দিশাহীন ছড়ানো প্রান্তর, রাঙা শাড়ি,
সূর্য শুষে নেয় সব মানুষ দুপুরবেলা, জনচিহ্নহীন
কোথায় এনেছ তুমি ? গ্রামান্তরে যাব কথা ছিল,
হীরার ঝলকে চোখ সরে আসে সফল দিগন্ত হতে, হায় বর্ণপ্রভা,
এখন দুপুরবেলা, গভীরে কী তপ্ত জল, এখন আমার
বাড়ির পিছনে অধিকার।

পিছনে পাতার শব্দ, ছায়াপ্রশাখার জটিলতা,
এত হাত আছে বলে মনে হয়, সেই কি আশ্রয় ?
এরা সব ঘিরে নেবে ? আমাকে কি ঘিরে নেবে প্রাক্‌পুরুষের
সদাচার, স্নেহকৌতুকের বিচ্ছুরণ, মায়াবী মমতা ?
এত ছায়াচ্ছন্ন ভালোবাসা ভালো নয়, আমি মুক্তি চাইনি কখনো,
আমি দুপুরের হাতে তাপময় নির্জনতা চাই
সে তো শুধু তোমারই পায়ের কাছে যাব বলে আপন স্বভাবে।

এখন যাবার মতো নই আমি। এই যে বাড়ির ভাঙা
অলিন্দের পিছনে লুকোনো আরো আড়ালের ভিতর-আড়ালে

দূর্বাদল ধরে আছি, এই যে আমার সব প্রচ্ছদ মোচন হলো
প্রাচীন দিঘির পাড়ে, রৌদ্ররুপালির রেখা শুশ্রূষার ধারাস্নানে
এই যে শরীর ভরে, সে তো শুধু
আমি আরো জলস্থলে বায়বী-বিহ্বল সর্বঘটে
আম্রপল্লবের ধ্যান দেব ব'লে আমার নিজের অঞ্জলিতে।

দেহ

আসছিলুম সনাতনীর মাঠ পেরিয়ে।
বুকেও অল্প চাপ ছিল, সলতে জ্বলার তাপ ছিল,
মুখোমুখি হতেও পারে গ্রহের ফেরে।
পাশে পাশে সতর্জন
'দেহ কোথায়' 'দেহ কোথায়' বলতে বলতে তাড়া করল
নাগরজন।
এখন ও-সব শুনতে পাই না, পকেটে এক ঝাপসা আয়না,
ভাঙা চিরুনি, চাদরমুড়ি, নৌকোচটি –
আসছিলুম, আসছিলুম তোমার প্রতি।

জন্মদিন

ছিল দিন জন্মদিন তোমার উৎসবে কাল রাত
প্রখর কৌতুকে ছিল তরলবসনা নারীদল
যাবার বেলায় ছুটা পরিচ্ছিন্ন মাংস আর হাড়
'বন্ধ করো দ্বার' বলে খলখল নেমেছিল হাসি
বাইরে যে পাখি ছিল মনেও পড়েনি তার নাম
আমি ফুল বুকে নিয়ে লজ্জাহীন ঘুমিয়ে পড়েছি
সুযোগের পাশাপাশি প্রতিহারী ছিল যে বেড়াল
আমার একাকী পাখি খুন করে খেয়ে গেছে কাল

নষ্ট

নষ্ট হয়ে যাবার পথে গিয়েছিলুম, প্রভু আমার !
তুমি আমার
নষ্ট হবার সমস্ত ঋণ
কোটর ভরে রেখেছিলে।

কিন্তু তোমার অমোঘ মুঠি ধরে বুকের মোরগঝুঁটি
সন্ধ্যাবেলা শুধু আমার
মুখের রঙে
ঝরে পড়ার ঝরে পড়ার
ঝরে পড়ার শব্দ জানে তুমি আমার নষ্ট প্রভু !

উদাসীনা

পা ছুঁয়ে যে প্রণাম করি সে কি কেবল দিনযাপনের নিশান ?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
নির্জীব পা সরিয়ে নাও কিনা।

দুঃখ এত ঝরাই, সে কি জানতে চেয়ে দেবদূতেরা কী চান ?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
তোমার মুখে সত্যিকারের ঘৃণা।

এখন আমি বুঝতে পারি আমায় নিয়ে কী চাও তুমি।
দুপুর জ্বালার মধ্যখানে
সূত্রপাতে অবসানে
তুমি আমায় দেখতে চেয়েছিলে
দু-হাত ধরেও থাকব উদাসীনা।

সুন্দর

লোকে তো কোথাও যাবে, তাই আসি, এমন কিছু নয়
নিহিত পাতালছায়া ভরে ছিল আকাশপরিধি।
কিছু তো দেখবে লোকে, তাই দেখি, ফসলের সীমা,
বুকের গেরুয়া জল, দ্বাদশীতে সব গ্রাম মিলেমিশে যায়
জেগে ওঠে রাত।
স্বভাবই তো পথ হারানো, তাই পথ হারিয়ে ফেলেছি
তবে জানি, মনে পড়ে কে এনেছে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে।
পাহাড়িয়া নিঃসাড়, কথকতা ছিল না কোথাও,
গোপনে নিজেই আমি মাছ ধরবার নাম করে
ডুবিয়ে দিয়েছি তাকে নিরিবিলি সাঁওতালি দিঘিতে!
ধনুক ছোঁড়েনি কেউ, বেঁচে গেছি, খুব বেঁচে গেছি,
নিখাত পাতালছায়া ভরে দেয় দিগন্তদখিনা।

লোকে তো জানে না কিছু। জানুক না, টেনে নিক পাপ,
ঝরে যায় নীল স্রোত, গাঢ় খাদে করুণার টান—
যদি-বা নিজেরই ছায়া হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে :
'তুমি কি সুন্দর নও? বেঁচে আছো কেন পৃথিবীতে?'

তুমি তো তেমন গৌরী নও

হিমানীকে

এই নদী, একা

গা থেকে সমস্ত যদি খুলে পড়ে যায়, আবার নতুন হয়ে ওঠা
সজীবতা
এর কোনো মানে আছে। অপরাধী? প্রতিদিন কত পাপ করি
তুমি তার কতটুকু জানো?
হাতের মায়ায় কত অভিশাপ সঞ্চিত রেখেছি, পাশাপাশি নদী,
তাও সব খুলে যায়; চেনা শহরের থেকে দূরে
উঁচুনিচু সবুজের ঢল
তার পাশে মাঝে মাঝে নত হতে ভালো লাগে লাবণ্যে উদ্ভিদ
তুমি তার কতটুকু জানো? এই নদী, একা
দুচোখ সূর্যাস্তে রাখে প্রবাহিত, বলে
আমি কি অনেক দূরে সরে গেছি?

কখনো-বা মনে হয়

কখনো-বা মনে হয় সরে যাওয়া তত ভালো নয়
এসব তো বহুদিন হলো।
ওরা যে ঝড়ের দিনে অপমানে-শাপে
আমারই দুহাতে রাখে হাত
ওরা যে আলোর দিনে ঘৃণাভরে তুলেছে ইস্পাত
পরস্পর দেহে
ওরা যে বনের পাশে বসে ছিল আগুন জ্বালিয়ে
শরীরের সব পাতা একে একে খসে পুড়ে যায়
অথবা গোপন ঘরে দেয়ালে রেখেছে নীলা নারীদের শব
এইসব ক্ষতি সে তো আমারই দেহের ক্ষয়, আজ মনে হয়
প্রতিশ্রুত শেষ ভালোবাসা—

যতবার সরে যাই জেগে উঠে বুদ্ধের দুচোখ।

শুশুনিয়া

ক্রমশ মিলায় দূরে শুশুনিয়া, বাংলা চাল
সাঁওতালসঙ্ঘের আদিমানবীর চোখ
আবার নতুন করে ঘিরে পাওয়া অবিশ্বাস, ভয়

যদিও কোথাও নেই, তবু এই গোধূলি স্ঠাম
বাঁকুড়ার ঘোড়া মধ্যমাঠে, মুহূর্তে সমস্ত স্থির
এমন-কী মুহূর্তই স্থির

আমরা সবাই খুব পরিমিত স্বাভাবিক কথা বলি
কিছুই ঘটেনি যেন, সত্যিও ঘটেনি কিছু, তবু
যেসব প্রপাতধারা কখনো দেখিনি তারা আসে শুশুনিয়া

পাথরপ্রকীর্ণ দুঃখ, হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসা
সিঁথিপথে লতানো, বিষাক্ত বীজ
তাছাড়া আমারও হাত অস্ত মানবীর হাতে ধরা

আর তুমি
পাহাড়ের পায়ে বসে কেঁপে ওঠো সতেজ ঝর্নার জল ঠোঁটে

দশ দিকে প্রকৃতি বিস্তর খোলা
আমার মুখেও না কি খুলে যায় ষোলো আনা লোভ
জলই জীবন, দস্যু জল —

ক্রমশ মিলায় দূরে শুশুনিয়া, বাংলা চাল
সহায় সম্বল !

মিথ্যে

এই মুখ ঠিক মুখ নয়
মিথ্যে লেগে আছে
এখন তোমার কাছে যাওয়া
ভালো না আমার।

তুমি স্নেহে সুদক্ষিণা বটে
মেঘময় ঠোঁট নেমে আসে
তোমার চোখের জলে আজও
পুণ্যে ভরে ওঠে রুদ্ধ দেশ
আমি তবু ছিঁড়ে যাই দূরে
এই মুখ ঠিক মুখ নয়
হলুদ শরীর থেমে যায়
        বোধহীন, তাপী
তোমার অনেক দেওয়া হলো
আমার সমস্ত দেওয়া বাকি।

ঘণ্টাঘর

টলমল করে উঠল চোখের উপর সব
পুরাতনী।
সদ্যসবুজ উদ্ভিদের তরল আভা যেন-বা যায়
প্রবহমান দিগন্তের
দীর্ঘ দূর।
পুরোনো দিন পুরোনো দিন
এখন আমার মনে পড়ে না স্নেহরঙিন
ঘণ্টাঘরে।

কোথায় রেখে দিয়েছিল জোড়াদিঘির পদ্মপাতা
কিশোরবেলার একাকিনী ?
এখন কেন জটাজুটের ভস্মলেখায় সরিয়ে নাও
চোখের উপর টলোমলো
পুরোনো দিন ?
কে বা বাজায়, কেন বা যায় একলা বেলা ?
শীতের রাতে আগুন কোথায় জ্বেলেছিলাম বন্য পাতা ?
শুকনো পাতা বাজিয়ে যায়
ঘণ্টাঘর—
সামর্থ্যহীন অভিমানের কুয়াশা, আজ
        সবাই কেন দেখল আমার মুখ ?

অশুচি

সবাই সতর্ক থাকে দুপুরে বা মধ্যরাতে তুলে দেয় খিল
পথের ভিখিরি মা-ও ভাঙা ক্রাচে ভর ক'রে বুঝে নেয় মাছির গুঞ্জন
আমারই সহজ কোনো প্রতিরক্ষা নেই
চুরি হয়ে যায় সব বাক্স বই সামঞ্জস্য
অথবা শুচিতা।

তাই পথে পথে ঘুরি, ফিরে যায় গৈরিক গোধূলি
এমন মুহূর্তগুলি চিতায় তুলেছি আজ চণ্ডালের মতো
তবু কেন
আমি যদি এতই অশুচি তবে পথিকেরা আজও কেন জল চায়
আমার দুয়ারে ? *

আমার সমান

তোমার দুখানি পায়ে হাত রেখে মনে হয়
কেঁপে ওঠে আমার সাগর।
আমার সাগর ? কত দূরে ?
পদনখে চন্দ্র ঝলে না কি ?
যায় দিন ভেসে যায় দিনের ওপারে যায় দিন
আমাকে কি খুলে দিয়েছিলে তুমি এতটা স্বাধীন
কোনোখানে বাঁধা নেই স্মৃতি ?
কে চেয়েছে এত স্বাধীনতা ?
দেশে দেশে রৌদ্রময় ঝাউ
হঠাৎ সবুজ তোলে মেঘে
আমাদেরও দিনগুলি মানুষের দৃঢ়তটে লেগে
ভেঙে পড়েছিল খান্ খান্—
মনীষীর মুখে বড়ো বাঁকা হাসি, আমাদের
ওসব লাগে না ভালো আর
তোমার দুখানি পায়ে ফিরে এলে মনে হয়
আমি আজ আমার সমান।

সল্টলেক

সল্টলেক ? এতক্ষণে লবণাক্ত হৃদয়ের
মানে বোঝা গেল।
তাহলে আমার জন্য কোথায় রেখেছ শেষ ঝাঁপ ?

বিকেলে পড়ন্ত জবা, ঝরে পড়ো জলের কিনারে
আমি আছি দুই হাত পেতে

আর যতক্ষণে তুমি ভরে নেয় তারার প্রলাপ
তুমি ওঠো বুকে
ততক্ষণে অন্ধকার মুছে নেয় আমার দুচোখ
বাড়ির ফলকে খুব বড়ো করে লেখা হয় : আত্মহত্যা পাপ।

শ্মশানবন্ধু

ঘরে নেবার আগে
একবার ছুঁতে দাও লোহা, আগুন।

সবার মুখ সন্দেহ করে করে কেটেছিল দুপুরের পথ
নিজের জামায় হাত রেখে,
কেন বলেছিলে পথে রিপুভয় ?

দীর্ঘ উপবাসী দিন ধূলিভস্ম শরীর শ্মশান
ঘরে নেবার আগে
একবার হাতে দাও লোহা, আগুন।

ভ্রমণ

যাওয়াই বেশি, ফিরে আসার পথ
চেনাজানা, খুবই সহজ, কম
এখন তাই যেদিকে চাই ফেরারই মরশুম।

না যেতে চান যদি মহম্মদ
সব সময়ে পাহাড় কাছে আসে ?

নিথর পাহাড় গৈরিকে সন্ন্যাসে
বলে, এ কি নিছক ভ্রমণ ?   দাঁড়াও কিংবা ফেরো
যেদিকে যাও আমিই ভবিষ্যৎ।

দুই হাতে দুই প্রান্ত

পথের মধ্যে নামিয়ে এনে হঠাৎ তুমি ডুব দিয়েছ জলে
এখন কোনো ইশারা নেই শহরজোড়া রৌদ্রনভস্তলে।

বুক আড়ালে একশো গ্রাম, জলের ধারে আমি শহরপাপী—
মধ্যদিনে এসপ্ল্যানেডে দারুণ ধায় মানুষবিহীন ট্রাফিক।

কোথায় যাবে ?   জল না আকাশ ?   কোন্‌খানে কার জলকিনারা আঁকা ?
উধাও ধাও দারুণ ধাও কত শিশুর রক্ত মাখো চাকায় !

ঝাঁপ দিতে চায় দুজন লোকই, একজন স্ত্রী একজন তার স্বামী,
দুপুরবেলার বিষণ্ণ জল ধরতে গেলে শাসিয়ে ওঠে তারাও

'যিশুর মতো দাঁড়াও'

দুই হাতে দুই প্রান্ত রেখে তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

সময়হরণ

ওরা আমায় বলেছিল, তোমার উপর ভার
রাখো নদীর ধার

ঘুরিয়ে নাও অশান্ত সংসার।
এ পথ দিয়ে যাবেন তোমার যিশু
এখন তিনি শিশুর চেয়েও নিচু
হয়তো এমন ভাগ্য হবে তুমিই তাকে করতে পাবে পার।

কখন গেল জীর্ণ বয়স ব্যাকুল অপহ্নবে
নিজের পিঠে বহন করে আমিই তোমায় রেখে এলাম কবে!
কোথায় ছিল জ্ঞান আমার? কোথায় ছিল অস্তিময়ী চেতন?
ভেবেছিলাম দুঃখ কেবল বেতন
ভেবেছিলাম বৃক্ষতলে প্রতীক্ষা-বা কিসের—
সময়হরণ করে আমার সময় গেল তারার আলোয় মিশে।

ভিখারি বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও

আমাকে কি নিতে চাও? কত জরি ছড়াও সুন্দরী
দুই হাতে ঝরাও ঝালর

আমাকে কি নেবে তুমি? কখনো দেখিনি আগে চোখে
এত নিরুপম ভালোবাসা

তোমার মেদুর হাসি ধরেছি বিশ্বের পাশাপাশি
আগবী ছটায় জ্বলে ঠোঁট

আমাকে কি নিতে চাও? নেবে কোন্ শূন্য মাঠ থেকে?
হায় তুমি অন্নপূর্ণা আজ!

চাও শুধু সমর্পণ, একে একে সব নাও খুলে
মেদ মজ্জা হৃদয় মগজ

তারও পরে চাও আমি খোলাপথে হাঁটু ভেঙে বসে
হাতে নেব এনামেল বাটি

জড়াও রেশমদড়ি কত জরি ছড়াও সুন্দরী
দিনে দিনে চাও পদতলে

ভিখারি বানাও, কিন্তু মনে মনে জানোনি কখনো
তুমি তো তেমন গৌরী নও !

খরা

অনেকেই ফিরে চায় জন্ম নিতে চায় বারবার
তুমিও চাও না ?
কেন নয় ? পুরুলিয়া তোমার সংসার ?

বৃষ্টিহীন দুই হাত উঠে এসেছিল খরা বুকে
এখন সমাজ
কার নাম বলে আর ? কাকে দিতে চায় সব ভার ?

মাটির ভিতরে জমে অন্ধকার, মাটি নিজে আজ
জানে না ফসল
তোমার চোখের জলে ভরে ওঠে ছোটো ছোটো ফল ।

নিঃশব্দ

যেমন চালাক ছেলে হঠাৎ ঘুরিয়ে নেয় মুখ
সে-রকম নয়

ওরা চারপাশ থেকে ঘিরে ওর বুকে রঙ মারে।

প্রথমে ভেবেছে রঙ, ঘরে ফিরে দেখে
আমায় লেগেছে রক্তকণা
যত মোছে তত ওঠে জ্ব'লে।

কেন, এত রক্ত কেন, কার সিঁড়ি বানাও পাঁজরে?
শব্দ হয়ে যায় শব্দহীন
যেমন সমস্ত রঙ একাকার শাদায় গম্ভীর

ভিতরে আগুন নিয়ে তবু শূন্যে চেয়ে থাকে ওরা
নিঃশব্দ ঝরানো নয়, নিঃশব্দ বুকের মধ্যে ধরা।

অপমান

'একটিও শব্দের জন্যে কারো কাছে ঋণী নই' ব'লে
সমস্ত শরীর জুড়ে অপমান ঢেলে বসে আছো
আমার যাবার পথে, দূর্বো চিবোবার ছল ক'রে
সবটুকু সবুজ অন্তঃসার খেয়ে নাও। দেখে দুঃখ হয়
কৃতজ্ঞও লাগে
কৃতজ্ঞ, কেননা সোজাসুজি হয়ে ওঠা ভালোই তো।
যেমন ভালোই নিত্য ঘনঘোর শেয়ালদায়
সকাল দশটায়
ধাবমান হাতলের পিছে পিছে পঙ্গু পরিশ্রমে
'আমি কি উঠব না' ব'লে পরিহাস কুড়োনো দৌড়োনো
আর ওরা অতর্কিতে
না-জেনে-বা ছুঁড়ে যায় জীবনানন্দের ভাঙা ঠোঁটে
'সকলে কি ওঠে ভাই? কেউ কেউ ওঠে।'

মানে অপমানে
সমস্ত শব্দের কাছে আমার ক্রমেই ঋণ বাড়ে

দশমী

তবে যাই
যাই মণ্ডপের পাশে ফুলতোলা ভোরবেলা যাই
খাল ছেড়ে পায়ে পায়ে উঠে-আসা আলো

যাই উদাসীন দেহে গুরুগুরু বোধনের ধ্বনি
যাই সনাতন বলিদান

কপালে দীঘল ভালো পূজার প্রণাম
যাই মুখঢাকা জবা চত্বর অঙ্গন বনময়

যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া
দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুনুচির অন্ধকার

মঠের কিনার ঘিরে কেঁপেওঠা বনবাসী হাওয়া
যাই পিতৃপুরুষের প্রদীপ-বসানো দুঃখ, আর

ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল
যাই পাকা সুপুরির রঙে-ধরা গোধূলির দেশ
আমি যাই

পুনর্বাসন

যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ঘাসপাথর
সরীসৃপ
ভাঙা মন্দির
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
নির্বাসন
কথামালা
একলা সূর্যাস্ত
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ধ্বস
তীরবল্লম
ভিটেমাটি
সমস্ত একসঙ্গে কেঁপে ওঠে পশ্চিমমুখে
স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল
ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়
এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন।

যা কিছু আমার চারপাশে আছে
শেয়ালদা
ভরদুপুর
উলকি দেয়াল
যা কিছু আমার চারপাশে আছে
কানাগলি
স্লোগান
মনুমেণ্ট
যা কিছু আমার চারপাশে আছে
শরশয্যা
ল্যাম্পোস্ট

লালগঙ্গা
সমস্ত একসঙ্গে ঘিরে ধরে মজ্জার অন্ধকার
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজে জলতরঙ্গ
চুড়োয় শূন্য তুলে ধরে হাওড়া ব্রিজ
পায়ের নিচে গড়িয়ে যায় আবহমান।

যা কিছু আমার চারপাশে ঝর্না
উড়ন্ত চুল
উদোম পথ
ঝোড়ো মশাল
যা কিছু আমার চারপাশে স্বচ্ছ
ভোরের শব্দ
স্নাত শরীর
শ্মশানশিব
যা কিছু আমার চারপাশে মৃত্যু
একেক দিন
হাজার দিন
জন্মদিন
সমস্ত একসঙ্গে ঘুরে আসে স্মৃতির হাতে
অল্প আলোয় বসে-থাকা পথভিখারি
যা ছিল আর যা আছে দুই পাথর ঠুকে
জ্বালিয়ে নেয় প্রতিদিনের পুনর্বাসন।

ভূমধ্যসাগর

আমাদের দেখা হলো আচম্বিতে
অধিকন্তু শীতে
পশ্চিমপ্রেরিত আমি, তুমি এলে পূর্বের প্রহরী

ছুই প্রান্ত থেকে ফিরে আমাদের দেখা হলো ভূমধ্যসাগরে।

হাতে হাত তুলে নিই, তুমি স্রোতে কেঁপে ওঠো, বলো
'এ কী
কী সাজে সেজেছ নেশাতুর
তোমারও দুহাতে কেন কলঙ্করেখার উজ্জ্বলতা
দেখো কত দীন হয়ে গেছ
সমস্ত শরীর জুড়ে বিসর্পিণী অত্যাচার অপব্যয় ছন্নছাড়া ভয়
এ তো নয় যাকে আমি রচনা করেছি স্তব্ধ রাতে
কেন তুমি এলে
আমাদের দেখা হলো এ কোন্ শীতার্ত পাংশু পটে
পশ্চিমবিলাসী তুমি, আমি পূর্ব দুঃখের প্রহরী!'

ঠিক, সব জানি
আমরা অনেকদিন মুখোমুখি বসিনি সহজে।
তোমার শ্যামল মুখে আজও আছে সজীব সঞ্চার
পটভূমিকায় ওড়ে সমুদ্রের আন্তরিক হাওয়া
আমি ভ্রষ্ট উপদ্রব নিয়ে ফিরি মেরুদণ্ড ঘিরে
এমন-কী সমুদ্রে ফেলি ছিপ
কিন্তু তবু
ছেড়ে দাও হাত, শুধু দেখো এই নীলাভ তর্জনী
ভূমধ্যসাগর
পুব বা পশ্চিম নয়, দেখো ওই দক্ষিণ জগৎ
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জলে ওঠে দূর বক্ষ অন্তরাল ভেঙে।
তাই এইখানে নেমে আমাকে প্রণত হতে হয়
আমারও চোখের জলে ভরে যায় অরুণা ধরণী
দুহাতে কলঙ্ক বটে, তবু
আমারই শরীর ভেঙে জেগে ওঠে ভবিতব্য দেশ
মৃত্যুর ঝমকে আর ঝোপে ঝোপে দিব্য প্রহরণে।
কলঙ্কে রেখো না কোনো ভয়

এমন কলঙ্ক নেই যা এই দাহের চেয়ে বড়ো
এমন আগুন নেই যা আরো দেহের শুদ্ধি জানে
তুমি আমি কেউ নই, শুধু মুহূর্তের নির্বাপণ
আমাদের ফিরে যেতে হয় বারে বারে
দেশে দেশে ফিরে ফিরে ঘুরে যেতে হয়
পরস্পর অঞ্জলিতে রাখি যত উদ্যত প্রণয়
সে তো শুধু জলাঞ্জলি নয়, তারই বীজে
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জেগে ওঠে আমাদের ভেঙে
তাই এইখানে নেমে আমাদের দেখা হলো সমুদ্রের পর্যটক তটে।

ধূপের মতন দীর্ঘ উড়ে যায় মেঘাচ্ছন্ন দিন
তোমারও শরীর আজ মিলে যায় সমুদ্রের রঙে
আমাদের দেখা হয় আচম্বিতে ভূমধ্যসাগরে।
কখনো মসৃণ নয় দেখো আমাদের ভালোবাসা
তোমাকে কতটা জানি তুমি-বা আমাকে কত জানো
তাই আমাদের ভালোবাসা
প্রতিহত হতে হতে বেঁচে থাকে দিনানুদিনের দগ্ধ পাপে
আমি যদি নষ্ট হই তুমি ব্যাপ্ত করো আর্দ্র হাত
তোমার ক্ষমার সজীবতা
আমার সঞ্চার আরো দীপ্য করে দেশ দেশান্তরে
আর মধ্যজলে
চোখে চোখে জ্বলে ওঠে ঘোর কৃষ্ণ বিস্ফারিত সসাগরা তৃতীয় ভুবন।

ফেরার সময় হলো, এসো সব সাজ খুলে ফেলি
দুই হাতে আপন্ন সংসার
নিয়ে চলো ঘরে

দিন হয়ে এল ক্ষীণ ভূমধ্যসাগরে।

খোলা মাঠ

প্রথম সুযোগে সব ছুটে যায় দ্রুত দূর দেশে।
জল নেমে যায় বটে, জলের অস্থায়
তখনো নামে না।
আমাদের শরীরের ধ্বস্ত পটে লেগে থাকে
ইতস্তত ভালোবাসা আজও
মনে হয় বলে উঠি 'ঠিক আছে, ভয় নেই
স্থির হও, সব স্থির হোক'
কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমারই বুকের দিকে
ঘুরেছে স্বর্যের মতো শোক
খুলে যায় আবরণ, উন্মোচিত হয়ে আসে
দুঃস্থ হাহাকার
প্রথম সুযোগমতো আমিও এ পুঞ্জীভূত ভিড়ে
দ্রুত চলে যাই, আর দেখি
আজ এই পৃথিবীর খোলা মাঠে যে-কোনো ঝঞ্ঝায়
যখনই বলাও কথা তখনই তা মিথ্যা হয়ে যায়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা

বাঁ দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আকাশের পটভূমি গড়ে
আর পদতলে
তখনো পৃথিবী ভাসে জলে।
'নিষ্ঠুরতা, অমোঘ অস্থায়'
ব'লে স্রোতে ঝাঁপ দিল শেষ লহমায় পাগলিনী
ভাসমান চালে শুধু একা বসে থাকে শিশু, আর
কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখ অসম্ভব নীল হয়ে যায়।

ভয়

আমাদের হাত তবু খুলে যায় পাপের অভ্যাসে।
যেমন অসংখ্য মাছি জড়ো হয় গ্রীষ্মের দুপুরে
আমার শরীর জুড়ে ততখানি ঘিরে ধরে ভয়
ভয় অতীতের জন্য, যা-কিছু করিনি তার অন্ধকার আস্বাদহীনতা
জিভে এসে লেগে থাকে জলহীন উপবাসে, আজ
আমাদের স্নায়ু থেকে ঝরে যায় শেষ পিপীলিকা।

আদমের জন্ম নয়

ওকে আমি বাঁচাতে পারিনি, ওকে
ভেসে যেতে দিয়েছি সহজে।
আদমের জন্ম নয়, পেশী তবু দৃঢ় ছিল প্রসারিত হাতে
ওরও হাত এক বিন্দু ছিন্ন হয়ে ছিল আর্তনাদে
তবু এ তো জন্ম নয়—পরস্পর ভিন্নতায় এ কি কোনো পৃথিবীতে যাওয়া?
আমি কি শূন্যের অধিবাসী?
এই ছত্রখান চোখ নিবিড় নৌকোও নয়
দৃষ্টি মেলে দিলে,
আমার দক্ষিণ হাতে ওর হাত মেলে না ঈশ্বর
শুধু দেশ ঘিরে ধরে জলময় আঘাতে আঘাতে
মগ্ন প্রাচীরের মতো ধ্বসে যায় আমার স্থিরতা
ওকে তুলে নিয়ে যায় নিশ্চিত অস্থির জলরাশি।

খুকু

তুমি তো ছিলে না তাই তোমার বসন্ত কতদূর
দেখে নিতে হলো। আমরা এখনো বেঁচে আছি।
আমাদের হাতে ওঠে শাবল, পরিত্রাণ, ঘরের গলির মুক্তি
স্তরে স্তরে ভেঙে তোলা হাসিময় লুকোনো ডায়েরি
আমাদের ঈর্ষা হয়, শ্রম হয়, কখনো-বা ভুলে
ভালোবাসা হয়,
দুঃখস্নান সেরে এলে এমন-কী বাজারে বিপিনে
সামাজিক প্রতিপত্তি রটে
'কতজন? কোন্‌জন? আপনি তো ছিলেন? কতটুকু ঠিক
চোখে পড়েছিল?'
এসব উত্তরে-প্রশ্নে মানবতা আপাতত খুশি হয়ে ওঠে—
তুমি তো ছিলে না, তাই
তোমার গলিত দেহ ভেসে যায় বারোমাসি স্রোতে।

ঋণ

আর আমাদের জন্য কোনো চঞ্চলতা নেই মাতা,
দেখো, অবশেষে
তোমাকে নিষ্ঠুর হতে হলো
মৃত্যুর আগের লগ্নে জলে জেগে ওঠে নীল গলা:
'অমঙ্গল হবে তোর
আমাকে কি ফেলে যাবি খোকা?'

আরুণি উদ্দালক

আরুণি বললেন, আমি জ্ঞানার্থী। গুরু আদেশ করলেন, যাও, আমার ক্ষেত্রের আল বাঁধো। পরে তাঁর ব্যাকুল আহ্বানে উঠে এসে বললেন আরুণি, জলপ্রবাহ রোধ করতে না পেরে আলে আমি শুয়েছিলাম, এখন আজ্ঞা করুন। ধৌম্য জানালেন, কেদারখণ্ড বিদারণ করে উঠেছ বলে তুমি উদ্দালক, সমস্ত বেদ তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক॥ পৌষ্য পর্বাধ্যায়, আদিপর্ব, মহাভারত।

তবে কি আমিই ভুলে যাই? দিকচক্রবাল শুধু বাসা বানাবার অন্ত ছল?
তবে কি অস্তিত্ব বড়ো অস্তিত্বের বেদনার চেয়ে? কার বাসা? কতখানি বাসা?
তোমার সমগ্র সত্তা যতক্ষণ না-দাও আমাকে
ততক্ষণ কোনো জ্ঞান নেই
ততক্ষণ পুরোনো ধ্বংসের ধারে অবসন্ন শরিকের দিঘি।
নীল কাঁচে আলো লেগে প্রতিফলনের মতো স্মৃতি, রাজবাড়ি
কবুতর ওড়ানো চত্বর
ভাঙা গ্রামে পড়ে আছো, শোনো
তবু একজন ছিল এই ধুলাশহরে আরুণি
সে আমাকে বলে গিয়েছিল আল বেঁধে দেবে সে শরীরে।

আমি গুরু অভিমানে বসে আছি সেই থেকে, দিন যায়—রাত
আবার রাত্রির পরে দিন, অস্পষ্ট দু-হাত
নেমে আসে জানুর উপরে
জানা ও কাজের মধ্যে বহু সেতু, দেখাশোনা নেই
ঘরে ঘরে সকলেই নিঃসঙ্গ প্রস্তুত করে লক্ষ্মী-উপাসনা
যে যার আপনসুখে চলে যায় পূর্ণিমার দিকে
আমার নিঃশীল বসে থাকা
বিকল্প বক্তৃতা দেয় ঘটে জমে-থাকা জল অলস মন্থর
হৃদয়ের কাছাকাছি মুখ নিলে ঘুরে যায় পাঁচটি পল্লব পাঁচ দিকে
আর সেই অবসরে ফেটে যায় জলস্রোত, কেননা প্রকৃতি নাকি শূন্যের বিরোধী।

হাঁটুজল বুকজল গলাজল
শান্তিজল হয়ে ওঠে নীলজল পীতজল গলাজল
ঘট ভেঙে আমাদের ধরে ফেলে অতর্কিতে ভাসমান শূন্যের বিরোধী
মধ্যরাত ছুঁড়ে দিলে নিজের পায়ের ভর খুলে যায় পঙ্কনীলময়
আর সেই অবসরে ছোটে বাণিজ্যের ঢেউ ছলনা প্রস্তুত থাকে দিগন্ত অবধি
যে-কোনো আঘাত লেগে উড়ে আসে চালচিত্র ধ্বসে যায় প্রাচীরের তল
কে কোথায় আছো বলে টলে পড়ে যায় সব কবুতর ভাঙা রাজবাড়ি
তোমাদের হাতেগড়া একাল-ওকাল-জোড়া ত্রিজগুলি ঝলকে মিলায়
পাশের বাড়ির বৌ শেষরাতে অন্ধকার ডানা ঝাপটায় খোলা স্রোতে
এদিকে সকাল আসে প্রায় পরিহাসময় কাঞ্চনজঙ্ঘার যোগ্য রুপালি ঠমকে।

বলে গিয়েছিল বটে, আছে কি না-আছে কে বা জানে
ভুলে যায় লোকে।
আবার সমস্ত দিক স্থির করে জল
এ-ও এক জন্মাষ্টমী যখন দু-হাত-জোড়া নীলশিশু হাতে নিঃস্ব দেহ
জল ভেঙে যায়
আলোর কুসুমতাপে ছড়ানো গো-কুল
যে-কোনো যমুনা থেকে পায়ে বাজে বিপরীত চৌকাঠে জড়ানো তিন বোন
মুহূর্তের তুড়ি লেগে উড়ে যায় সমূহ সংসার
কেননা দেশের মূর্তি
কেননা দেশের মূর্তি দেশের ভিতরে নেই আর!

গড়ে তুলবার দিকে মন দেওয়া হয়নি আর কী
সহজেই বাঁধ ভেঙে যায়
চেতাবনী ছিল ঠিক, তুমি-আমি লক্ষই করিনি
কার ছিল কতখানি দায়
আমরা সময় বুঝে ঝোপে ঝোপে সরে গেছি শৃগালের মতো
আত্মপতনের বীজ লক্ষই করিনি
আমার চোখের দিকে যে ভিখারি হেসে যায় আমি আজ তার কাছে ঋণী
এত দ্বিধা কেন বলে লাঞ্ছনা করেছে যারা তাদের সবার কাছে ঋণ

অবনত দিন

ভাবে, একা বাঁধ দেবে, তা কি কখনোই হতে পারে ?
আমাদের বিশ্বাস ঘটে না
আমাদের ঘরে ঘরে প্রতি পায়ে জমে ওঠে পলি
আর অলিগলি
আতুর বৃদ্ধের হাতে খুঁজে ফেরে হারানো শরীর
আমাদের ঠোঁটে ওঠে হাসি
দুপুরে বাতাসভরা কেঁপেওঠা অশথের পাতা
যেমন নির্জন শব্দ তোলে
এখনো অম্বার স্বর ততখানি ঝরে পড়ে 'সুমন, সুমন'
আমাদের চোখে ভাসে সাবেক করুণা
অথবা কখনো
নিজেরই অথর্ব দেহ যেমন ধিক্কারে টেনে প্রতি রাত্রিবেলা
তোমার মুক্তির পায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই
তেমনই দূরের জলে দিয়ে আসি মৃত গাভী গলিত শূকর আর তোমাকেও মা
মুখে যে আগুন রাখি তত পুণ্য রটে না আমার
মৃত্যুশোকে কার অধিকার
কেবল অম্বার কণ্ঠ এখনো নদীর জলে 'সুমন, সুমন'
আর আমি বলে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও
স্পষ্ট হও, বাঁচো —
শুধু মূর্খ অভিমানে বসে থেকে জলস্রোতে কখন যে আরুণি সুমন
তৃষ্ণাদেবতার মূলে একাকার হয়ে যায় তা আমার বোধেও ছিল না।

কখনো চোখের জল হয়ে ওঠে সোনা
কিন্তু কখন ? সে কি এই আচ্ছন্ন বিলাপে ?
দীর্ঘ আলপথ ঘুরে এই কুব্জ ক্যারাভান তোমার দুয়ারে এসে ভিখারি দাঁড়ায়
আর তুমি
শোকের আতসগড়া তুমি কী সুন্দর মজ্জাহীন
রাত্রিগুলি ওড়াও আকাশে
বণিকের মানদণ্ড মেরুদণ্ড বানাও শরীরে

বেতন জোগাও চোখে প্রত্যহযাপনছলে রাজপথে অন্ধকার ঘরে
তখন ?
হে নগর, দীপান্বিতা ভাস্বতী নগরী
আকণ্ঠ নাগরী
মহিষের ধ্বস্ত দেহে যত লক্ষ রক্তবিন্দু জ্বালায় শকুন
তোমার রাত্রির গায়ে তার চেয়ে বেশি ফুলঝুরি
পোহালে শর্বরী
তোমারই প্রভাতফেরী মেতে ওঠে ত্রাণমহোৎসবে।

হবে, তাও হবে। মাথা খুব নিচু করে সবুজ গুল্মের ছায়া মুখে তুলে নিলে
ওর দেহ হয়ে ওঠে আমাদেরই দেহ, তাছাড়া এ অভিজ্ঞতার
অন্য কোনো মানে নেই
যখন আঙুল থেকে খুলে পড়ে নির্মল নির্ভর
তখনো দুখানি হাত দুঃখের দক্ষিণ পাশে স্থির রাখা
আরো একবার ভালোবাসা
এই শুধু, আর কোনো জ্ঞান নেই
আর সব উন্নয়ন পরিত্রাণ ঘূর্ণমান অগণ্য বিপণি দেশ জুড়ে—
যা দেয় তা নেবার যোগ্য নয়
আমাদের চেতনাই ক্রমশ অস্পষ্ট করে সাহায্যের হাত
আছে সব সমর্পণে—এমন-কী ধ্বংসের মধ্যে—আবার নিজের কাছে
ফিরে আসা, বাঁচা। তাই
যে বলেছে আজও এই প্লাবনে সংক্ষোভে মেঘে আমার সমস্ত জ্ঞান চাই
সে বড়ো প্রত্যক্ষ চোখে আপন শরীর নিয়ে বাঁধ দিতে গিয়েছিল জলে—

লোকে ভুলে যেতে চায়, সহজেই ভোলে।

জাবাল সত্যকাম

আচার্য বললেন, এমন বাক্য ব্রাহ্মণেই সম্ভব। হে সৌম্য, সমিধ আহরণ করো, তোমায় উপনীত করব, কারণ সত্য থেকে তুমি ভ্রষ্ট হও নি। ক্ষীণ ও দুর্বল গোধনের চারশো তাঁকে পৃথক করে দিয়ে বললেন, অনুগমন করো। বনাভিমুখে তাদের চালিত করে সত্যকাম জানালেন 'সহস্র পূর্ণ না হলে আমি ফিরব না।' ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।৪

তুমি দিয়েছিলে ভার, আমি তাই নির্জন রাখাল।
তুমি দিয়েছিলে ভার, আমি তাই এমন সকালসন্ধ্যা
আজানু বসেছি এই উদাসীন মর্যাদায়
চেয়ে আছি নিঃস্ব চোখে চোখে।
এ কি ভালোবাসে ওকে? ও কি একে ভালোবাসে?
আমারই দু-হাতে যেন পরিচর্যা পায়
ভালোবাসাবাসি করে। যখন সহস্র পূর্ণ হবে
ফিরে যাব ঘরে
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
আয়তনবান এই দশ দিক বায়বীয় স্বরে
ফিরে নেবে ঘরে
এখন অনেকদিন বন্ধুদল তোমাদের হাতে হাতে নই
এখন স্পষ্টই
আমার আড়াল, বনবাস।

ভাবো সেই সন্ধ্যাজাল অস্ফুট বাতাস আমি আভাময় পায়ে হেঁটে গেছি
পাথরবিছানো পথে পথে
তোমার দুঃখের পাশে দীক্ষা নেব ইচ্ছা ছিল কত
প্রেমের পল্লব সর্বঘটে
ভেবেছি এত যে দল, দল দল, আমারও কি জায়গা নেই কোনো?
মাঠের বিপুল ভেঙে দোলানো লণ্ঠন যায়, দূরে সরে বালকের স্মৃতি

প্রধান সড়কে আমি, আমারও কি জায়গা নেই কোনো ?
পদ্মার তুফান দেয় টান নৌকো খান্ খান্
পেরিয়ে এসেছি কত সেতু
তোমার দুঃখের পাশে বসে আছে জনবল চোখে রুপা ইলিশের দ্যুতি
আমিও প্রণাম করি বুকে লাগে শ্যামল বিনয়ভূমি, তুমি
মাথায় রেখেছ হাত স্নেহভরে, বলো
'কী তোমার গোত্রপরিচয় ?'

পরিচয় ? কেন পরিচয় চাও প্রভু ?
ওই ওরা বসে আছে অন্ধকার বনচ্ছায়ে সকলেই ঋদ্ধপরিচয় ?
বনে ভরে আগুনকুসুম—
আপন সোপানে কারা জলস্রোতে দেখেছিল মুখ ?
বুকে জ্বলে আগুনকুসুম—
আমি যে আমিই এই পরিচয়ে ভরে না হৃদয় ?
কেন চাও আত্মপরিচয় ?
কোথায় আমার দেশ কোন্ স্থিতি মৃত্তিকার কুল
কোন্ চোখে চোখ রেখে বুকের আকাশ ভরে মেঘে
দেশদেশান্তর কালকালান্তর কোথায় আমার ঘর
তুমি চাও গোত্রপরিচয় !
পিছনে পিছনে এত বাঁধা আছে হৃদয়ের মানে আর
শিকড়ে শিকড় জমে টান
গঙ্গা এত বহমান দীর্ঘ দেশকাল জুড়ে আমারও হৃদয়
ধুলো পায়ে ফিরে বলে কোথায় আমার গোত্র
কী আমার পরিচয় মা ?

ছুটে সরে যাই দূরে ঘরে পরে সদরে অন্দরে
কী আমার পরিচয় মা
শহরে ডকে ও গ্রামে ফুলে ওঠে পরিশ্রম গাছে ওড়ে রঙিন বেলুন
কী আমার পরিচয় মা
ধরো নদীতীর শোনো শব্দ যেন জমে ছিল জাহাজের সারি

জেটিতে জুটায় ভালোবাসা
টন টন শস্যে মুখ ঢেকে যায় রৌদ্রহীন শস্যের শরীর গলে যায়
কী আমার পরিচয় মা
পোশাকের নিচে আমি আমার ভিতরে জমে নির্বোধ পোশাক
আমার দেহের কোনো পরিত্রাণ থাক না-ই থাক
মুখে ঠিক উঠেছিল গ্রাস
কী আমার পরিচয় মা
দারুণ কুঠারে কেউ ছিঁড়ে দিয়েছিল দড়ি
দ্রুত খুলে যায় সব তরী
টেবিলে গেলাস রেখে উঠে আসে প্রণয়িনী হাত ভাঁজ করে বলে, এসো,
কনুই বাঁকিয়ে ওরা মিশে যায় ক্রিসমাস ভিড়ে
টুইস্ট টুইস্ট টুইস্ট
কিছুতেই কিছু নয় ললাটে না ভাষায় না
নতনীল বুকে কিছু নয়
আমার জিভের বিষে ঝরে যায় জরতী ভিখারি
সব গাড়ি থেমে থাকে রমণীর রক্তিম নখরে
কী আমার পরিচয় মা ?

বহুপরিচর্যাজাত আমি, প্রভু, পরিচয়হীন।
ওরা হাসাহাসি করে, মুখে থুতু দেয়, ঢিল ছুঁড়ে মারে, আমি
পরিচয়হীন
জলস্থল সর্বতল আমার বিলাপ কাঁপে পরিচয়হীন।
গোপনে আপনভূমি ক্ষয়ে যায় কবে
যেমন চোখের আড়ে সরে যায় বসন্তবয়স আর
পিয়ানোর পিঠে জমে ধুলো
যেমন উত্তান রাত কেঁপে ওঠে মহোৎসবে নীল
হাতে হাত ছুঁয়ে গেলে বিষ হয়ে ফুলে ওঠে শিরা ও ধমনী, ওরা বলে
কিছুতেই কিছু নয়, ভাষায় না পোশাকে না মুখের রেখায় কিছু নয়,

কী-বা আসে যায়
বুকের তোরণে কোনো স্বাগতম্ রাখেনি যুবতী
কী সুন্দর মালা আজ পরেছ গলায়
আজ মনে পড়ে মাগো তোমার সিঁদুর এই নিখিল ভুবনে
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে
ভাষায় না পোশাকে না মুখের রেখায় নয় চোখের নিহিত জলে নয়
আমি খুব নিচু হয়ে তোমার পায়ের কাছে বলি, আজ ক্ষমা করো প্রভু
আয়তনহীন এই দশ দিকে আজ আর আমার দুঃখের কোনো ভারতবর্ষ নেই।

বহুপরিচর্যাজাত পথের ভিক্ষায় জন্মদিন
প্রভু এই এনেছি সমিধ
অন্ধকার বনচ্ছায়ে দীর্ঘ তালবীথি সত্যকাম
এনেছি সমিধ
আমার শরীর নাও দুই হাতে পুঁথি ও হৃদয়
তুমি চাও আত্মপরিচয়
শস্যময় ভালোবাসা প্রান্তরে নিহিত বর্তমান
আমার তো নাম নেই, তুমি বলেছিলে সত্যকাম।

এখন স্পষ্টই
আমার আড়াল, বনবাস
এখন অনেকদিন বন্ধুদল তোমাদের হাতে হাতে নই।
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
ফিরে যাব ঘরে
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
আয়তনবান এই দশ দিক গাঢ়তর স্বরে
ফিরে নেবে ঘরে
এখন আজানু এই উদাসীন মাঠে মাঠে আমার সকাল
তুমি দিয়েছিলে ভার আমি তাই নির্জন রাখাল।

আদিম লতাগুল্মময়

বন্ধুকে, যে আর বন্ধু নেই

পাথর

পাথর, নিজেই আমি দিনে দিনে তুলেছি এ বুকে
আজ আর নামাতে পারি না।

আজ অভিশাপ দিই, বলি, ভুল নেমে যা নেমে যা
আবার প্রথম থেকে চাই
দাঁড়াবার মতো চাই যেভাবে দাঁড়ায় মানুষেরা

মাথায় উধাও দিন হাতের কোটরে লিপ্ত রাত
কী ভাবে বা আশা করো মন বুঝে নেবে অন্য লোকে
সমস্ত শরীর জুড়ে নবীনতা জাগেনি কখনো

মুহূর্ত মুহূর্ত শুধু জন্মহীন মহাশূন্যে ঘেরা
কার পূজা ছিল এতদিন ?
একা হও একা হও একা হও একা হও একা

আজ খুব নিচু করে বলি, তুই নেমে যা নেমে যা
পাথর, দেবতা ভেবে বুকে তুলেছিলাম, এখন
আমি তোর সব কথা জানি।

আনন্দ

'তবে তো আমারই ভালো, আনন্দই আছে ত্রিসংসারে
যদি বলো।
তবে তো আমারই দেহ আনন্দের মহাপদ্ম খোলে।

তুমি আছো আমি আছি আমাদের ভয় ও বিবেক অনায়াসে
মসৃণ পাতার থেকে অনাবৃত জলে ঝরে যায়,
তবে তো তোমারই ভালো, এসো
ধন্ত হও, এসো' —

ব'লে সেই নারী নিজে আমার শরীরে ঝুঁকে প'ড়ে
আমার আনন্দ শুষে খায়।

অবিমৃষ্য বালি

পথে এসে মনে পড়ে বন্ধু বলেছিল এই সবই।

বলেছিল, যা, কিন্তু সমস্ত লাবণ্য তোর হেলায় হারাবি।
দুপুরের বিষ লেগে নষ্ট হয়ে যাবে দুই চোখ
বিকেলের মতো খুব নিরাশ্বাস হয়ে যাবে মাথা
গায়ের কলঙ্ক যেন নিশীথের হাজার তারার
দাহ নিয়ে জলে যায়, আর
নিজেই নিজেকে খুঁড়ে দিন-দিন পাবি অন্তহীন
অবিমৃষ্য বালি —

আমাকে ঠকালি যদি, নিজেকে তো এতটা নামালি!

সনাতন

সব খিল খুলে দেয় দ্বারী।
বলে, 'এসো', বিশ্বাস না হয় যদি দেখো
সবই আছে ঠিকমতো, ঠিক

এই-সে সিন্দুক, এই সেই একান্ত দর্পণ, তেলছবি
এই ঘর, এইখানে রেখে যাও সব—'

ব'লে হাসে। কেননা তখনো সনাতন
আমার দুপাশে দুই নারী

বিষ

হাত খুলে দেখা গেল হাতে কিছু নেই
এবার তাহলে খোলো পা

খোলা হলো পা
তাও নেই! তাহলে কি মাথা? খোলো মাথা

তার পরে একে একে খোলা হলো মাথা ঘাড় বুক পিঠ উরু
কোনোখানে নেই কোনো বিষ।

কিন্তু যেই জুড়ে দিই, দুই চোখ হয়ে ওঠে ঈষৎ কপিশ
গোল হয়ে ফুলে ওঠে হলুদ শরীর, ঝুল হয়ে
খুলে পড়ে নিরেট আঙুল

মাথা ঘাড় বুক পিঠ হাত পা বা উরু
একযোগে কেঁদে ওঠে, বিষ বিষ বিষ
ঢেলে দাও সমস্ত অগুরু—ঢালো—খোলো

খোলা হলো হাত। না, হাতে কিছু নেই
এবার তাহলে খোলো গা।

ব্যভিচার

পুজোবাড়ি মনে পড়ে ? কী করে বা হবে, তুমি গাঁয়েই যাওনি।
ওকে না কি গ্রাম বলে ?
ডিমি ডিমি দ্রিদিম দ্রিদিম
তা ছাড়া ঢাকেরও কোনো তালজ্ঞান নেই।

এত যে প্রণয় করো, অতীতের জলস্রোত এড়াতে পারো না।
যদি বলি, এসো, বড়ো এক ব্রিজ বাঁধা যাক—
কেঁপে ওঠো। ভাবো এই অতল পাতালে ফেলে জলধারা কোথায় পালাবে।

যদি বলি, গল্প বলো, তোমার নিজের গল্প বলো—
চিবুকে পাষাণ জাগে
নীরবতা শীতল দেবতা।

পুজোবাড়ি মনে পড়ে ? নবমীর বলি ?
কী করে বা হবে
তোমার স্মৃতিতে জমে অন্য ব্যভিচার
আমি তার কিছু দান চাই।

অন্তরাল

কিছু অন্তরালে আছে। দুজনার সাজানো জীবন
ভেঙে দিলে জেগে ওঠে বাড়িঘেরা রুপালি দুপুর।

সবই তো তরল, জল, হাওয়া আর ক্ষত-জাগা-ক্ষুর -
ডুবে যায় দেয়ালে বাঁকানো গাছ, প্রাকৃতিক মন।

আবার পিছনবেলা টেনে নেয় বাতাসের লোনা
ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় ব্যবহৃত পুকুরের জটিল শিয়রে।

তখন দুজনে জানে, যা কিছু এসেছে ফেলে ঘরে
সবই ছিল সুখময়, শুধু সুখে ধমনী ছিল না।

প্রপাত

বুকের প্রপাত ঝরে যায়
এতগুলি ডিঙা তুমি কোথায় পেয়েছ ভুলে যাই
বুকের প্রপাত ঝরে যায়

জল, এত জল, শুধু চারিদিকে জল খেলা করে
বুকের আকাশ সরে যায়
এমন প্রপাত ঝরে যায়

আর তুমি ডিঙা নিয়ে এই সব ডিঙা নিয়ে যাও
আমার চোখের দিকে চাও
বলে যাও কেন চলে যাও বলে যাও

বুকের প্রপাত ঝরে হায়
জল, এত জল, শুধু চারিদিকে বিপরীত জল
পটের আকাশ সরে যায়।

বিদায়

তুমি আমার ভাই। তুমি সামনে রাখো আমার
নিঃস্ব অবসান

তুমি আমার ভয়। তুমি হাত থেকে নাও হাতে
গোপন পরিচয়

সেই পরিচয় আমার ? সেই বাস্তবতাহীন
চরিত্রহীন মুখ ?

তুমিই আমার আমি। তাই আমার গায়ে ছাই
কলঙ্ক সবখানি

আমার কথাও তাই। যদি না বোঝো তার দায়
সমস্তটাই আমার

থালায় ভরা জল। আমি সেই জলে মুখ দেখে
বিদায় নিতে চাই।

পুতুলনাচ

এই কি তবে ঠিক হলো যে দশ আঙুলের সুতোয় তুমি
ঝুলিয়ে নেবে আমায়
আর আমাকে গাইতে হবে হুকুমমতো গান ?

এই কি তবে ঠিক হলো যে বৃষ্টিভেজা রথের মেলায়
সবার সামনে বলবে ডেকে, 'এসো
মরণকূপে ঝাঁপাও' ?

আমার ছিল পায়ে পায়ে মুক্তি, আমার সহজ যাওয়া
এ গলি ওই গলি

আমার ছিল পথশ্রমের নিশানতোলা শহরতলি
উত্তরে-দক্ষিণে

আমার চলা ছিল আমার নিজস্ব, তাই কেউ কখনো
নেয়নি আমায় কিনে

এমন সময় তুমি আবিল হাত বাড়িয়ে যা পাও
স্বাধীনতায় দিচ্ছ গোপন টান—

এই কি তবে ঠিক হলো যে আমার মুখেও জাগিয়ে দেবে
আদিমতার নগ্ন প্রতিমান?

দল

এই খোলা দুপুরে তোমার মুখে ধরেছি বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও
এই খোলা দুপুরে তোমার মুখে ধরেছি বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও
আমার চোখের সামনে তোমার পতন হোক আদিম, লতাগুল্মময়

আমার চারদিকে দল মাথার ভিতরে বা ধমনীতে বিঁধে যায় দল
দুহাতে পেষণ করি দুচোখ বন্ধ করো বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও
তোমার শব নিয়ে বানাই দুর্গের প্রাকার

তোমাকে আদর করে তোমার শরীর ভরে জাগিয়ে দিয়েছি সব নীল ফল
এখন আমার তুমি নষ্ট হও তুমি ধ্বংস হও তুমি বিষ খাও
আমি যা বলি আজ হও তাই।

সব চুল খুলে দাও তোমার চুলে বেঁধে কণ্ঠনালি এসো ছিঁড়ে দিই
এই খোলা দুপুরে নিজের শরীরের আগুনে সব চুল জ্বেলে নাও
ধ্বংস হও তুমি চেতনাহীন হও আমার হাতে তোলা বিষ খাও

বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও।

ইঁদুর

চোখ বেয়ে নেমে আসে থিকথিক
ঠোঁট দুটো উঁচু হয় টুকুস টুকুস।
সহিতে পারি না আর, খোলো, খুলে রাখো

নকল মুখোশ।
দেহ শুধু চলে যায় ঠিক ঠিক।

বড়ো ঘৃণা কোণে কোণে, ঘর ভরে গিয়েছে ইঁদুরে
প্রণাম চতুর দাঁত
কিন্তু এত জ্বালা কেন মুখে ?

রাজনীতি

ওরা বলে বড়োই সহজ।
ওরা খুব ভুল বলে না তা
পথে যেতে টের পাই রোজ।

দিনের রাতের সহচর
তারও মুখে তুলে ধরি বিষ
বলি, তোর চার পাশে চর !

চার পাশে ছিল যে মানুষ
তার কানে চুপি চুপি বলি,
এখনো হলো না তোর হুঁশ ?

তার পরে আদিম সাবেকি
ফেনা জেগে ওঠে দুই মুখে
আর আমি দূর থেকে দেখি :

ভাঙাবাড়ি লক্কড় রাবিশ —
তারই মাঝখানে পড়ে আছে
বিষ দিয়ে তুলে নেওয়া বিষ !

ক্রমাগত

এইভাবে হতে থাকে ক্রমাগত
কেউ মারে কেউ মার খায়
ভিতরে সবাই খুব স্বাভাবিক কথা বলে
জ্ঞানদান করে

এই দিকে ওই দিকে তিন চার পাঁচ দিকে
টেনে নেয় গোপন আখড়ায়
কিছু-বা গলির কোণে কিছু অ্যাসফল্ট রাজপথে
সোনার ছেলেরা ছারখার

অল্প দুচারজন বাকি থাকে যারা
তেল দেয় নিজের চরকায়
মাঝে মাঝে খড়খড়ি তুলে দেখে নেয়
বিপ্লব এসেছে কতদূর

এইভাবে, ক্রমাগত
এইভাবে, এইভাবে
ক্রমাগত

বিকেলবেলা

সারাদিনের পর অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি আজ বিকেলবেলা
আর স্বপ্ন দেখছি যে-স্বপ্ন দেখার কোনো কথা ছিল না আমার
যে, একটা নয় দুটো নয় তিন-তিনটে রুপোলি গোলক ঝকঝক করছে
চালু আকাশে
তার নিশ্বাস যতদূর পৌঁছয় ততদূর টলে পড়ছে মানুষ।

সবার মুখ তাই থমথমে আমি জিজ্ঞেস করি ওখানে কী, কী হয়েছে ওখানে
শুনে একজন বলে ও কিছু নয়, মা বলল জলের রঙে আগুন
অনেকদিন আগে এ-রকমই হয়েছিল একবার, ঘরদুয়োর সব বন্ধ করে দাও
সেবার আর বাঁচেনি কেউ মড়কে ছেয়ে গিয়েছিল দেশ।

রুপোলি আলো পারদের মতো ঘন হয়ে এগিয়ে আসে আমার মুখের ওপর
যেন জল থেকে গাঢ়তর জলে ডুবে যায় সমস্ত শরীর
কাগজে তৈরি আমার ভাইয়ের মুখ ঝুলে পড়ে কার্নিশ থেকে বাইরের হাওয়ায়
আর দেখতে দেখতে অবেলার ঘুম ভেঙে যায়, দুচোখ ভার।

যাদব

পলকে পলকে ছিল অপমান, মনে করে দেখো
সহজে চেয়েছ ত্রাণ
তোমাদের হাতে ছিল হাডভাঙা দলীয় নিশান

এইবার সময়, সাত্যকি

সব শেষ হয়ে যাবে, সমস্ত যাদব বংশ. যে-কোনো সবুজ ঘাস
হাতে নিলে হয়ে ওঠে মুষল মুদ্গর ধ্বংসবীজ

এইবার সময়, সাত্যকি

মাথায় গিয়েছে মদ, এ-রকমই রীতিহীন খেলা!

আদর

তোমার গলায় আমার আদরের চিহ্ন
দুহাত বেয়ে নেমে আসে ভালোবাসার প্রতিভা
শেয়ালের ডাক
আর যত রাত বাড়ে
তোমার গলায়
যে-কোনো আঙুল দেখি হয়ে ওঠে শস্ত্রময় বিশ্বাসঘাতক

গোপন আদরে তারা দিনযাপনের সব রক্ত খেয়ে যায় !

যুক্তি

যা বলতে চান মুখে বলবেন
গায়ে হাত দেন কেন ?

ছুঁড়ে ফেলে দেব বাস থেকে টেনে
বেশি কথা বললে ।

ফের এই পথে আসতে হবে না ?
খুব যে বেড়েছে তেজ—

কাল থেকে এই হাতেই খতম
তিনটে সাকুল্যে !

হা রে রে হা রে রে হা
তবে নেমে আয় না

তার পরে মহা কুরুক্ষেত্র
খড়্গে ও ভল্লে

যা বলতে চাই সেটা ঠিক নয়
অস্ত্রেরা বললে।

স্লোগান

এমনিভাবে থাকতে গেলে শেষ নেই শঙ্কার
মারের জবাব মার

বুকের ভিতর অন্ধকারে চম্‌কে ওঠে হাড়
মারের জবাব মার

বাপের চোখে ঘুম ছিল না ঘুম ছিল না মা-র
মারের জবাব মার

কিন্তু তারও ভিতরে দাও ছন্দের ঝংকার
মারের জবাব মার

কথা কেবল মার খায় না কথার বড়ো ধার
মারের মধ্যে ছল্‌কে ওঠে শব্দের সংসার।

মহিষ

ফিরে যায় মন্থর মহিষ।
চোখ দেখলে মায়া হয়, চোখে কত পুরোনো জলের
উৎস আছে। দল, দল—তবু সে দলের

কেউ নয়।   বাতাস বাজিয়ে দেয় শিস
শিং তাই পাক দিয়ে ঘুরে যায়
এসো পিছে কে আছো সহিস।

সময় ঘুমিয়ে পড়ে, মাঝে মাঝে, মাঠের ছায়ায়।

লোকে লোকে অন্ধকার পথে নীল পিচ্ছিল মিছিল
শরীরে ওজন বড়ো শরীরে ওজন
চলা যায় না   থামা যায় না   থামানো যায় না
শরীরে ওজন।

কার কাকে কিসে প্রয়োজন ?
কিছুই না।   চলে, চলে,
ঘুন্টি বাজে দড়িতে শিথিল।

নিগ্রো বন্ধুকে চিঠি

রিচার্ড, তোমার নাম আমার শব্দের মধ্যে আছে
রিচার্ড রিচার্ড।
কে রিচার্ড ?   কেউ নয়।   রিচার্ড আমার শব্দ নয়।

রিচার্ড, তোমার নাম আমার স্বপ্নের মধ্যে আছে
রিচার্ড রিচার্ড।
কে রিচার্ড ?   কেউ নয়।   রিচার্ড আমার স্বপ্ন নয়।

রিচার্ড, তোমার নাম আমার দুঃখের মধ্যে আছে
রিচার্ড রিচার্ড।
কে রিচার্ড ?   কেউ নয়।   রিচার্ড আমার দুঃখ নয়

শীতে একটি নিগ্রো মেয়ে

মনে রেখো ঈশা মনে রেখো
পাথর, শীতার্ত জল আমার দুচোখে মনে রেখো
তোমার শোণিত পাত্রে রেখো

মনে রেখো ঈশা মনে রেখো
এই যে গলির মুখে বিঁধে আছি ট্রাফিকবিহীন
ক্রিসমাসে হিম

আর ওরা কুয়াশা ওড়ায় শূন্যে আগুন জ্বালায় মধ্যরাতে
আমার শরীর থেকে ছিন্ন ছিন্ন করে নেয় রুটি
আমাকে চেনে না ওরা বলে যায় একবার দুবার তিনবার

মনে রেখো ঈশা মনে রেখো
কী করেছে জানে ওরা আমার শরীর থেকে খুলে নেয় শেষ আচ্ছাদন
দুই পায়ে দুঃখ বিঁধে যায়

বিদেশি পথিক পাশে আমি ওর ভাঙা মুখে রেখেছি আমার মুখচ্ছবি
এইভাবে মনে রেখো ঈশা
তাপহীন চলে যাই তোমার প্রেমিক হিংসাময়।

সত্যি বলার মানে

দিনদুপুরে রাতবিরেতে
সত্যি কি এর মানে আছে
বলতে বলতে সত্যি কোনো
মানে

জানতে জানতে সত্যি আমার
পায়ের চাপে অল্পস্বল্প
সত্যি

মানের সত্যি সত্যি মানে
খুঁজতে খুঁজতে পথের মধ্যে
হঠাৎ

কৌটো ঝাঁকায় : নিদেনপক্ষে
দশটা নয়া হবে মশাই ?

'রক্ষে করুন' বলতে বলতে
চলতে থাকি, এ দুর্ভিক্ষে
সত্যি কি আর
সত্যি বলার মানে আছে।

কলকাতা

বাপজান হে
কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে
আমিই কিছু জানি না

আমারে কেউ পুছত না
কইলকাত্তার পথে ঘাটে অন্ত সবাই দুষ্ট বটে
নিজে তো কেউ দুষ্ট না

কইলকাত্তার লাশে
যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্যিকালের মজা পুকুর
শ্যাওলাপচা ভাসে

অ সোনাবৌ আমিনা
আমারে তুই বাইন্ধা রাখিস, জীবন ভইরা আমি তো আর
কইলকাত্তায় যামু না।

বোকা

আমি খুব ভালো বেঁচে আছি
ছন্দের সংসারে কানামাছি।

যাকে পাই তাকে ছুঁই, বলি
'কেন যাস এ-গলি ও-গলি ?

বরং একবার অকপট
উদাসীন খুব হেসে ওঠ্,—'

শুনে ওরা বলে, 'এটা কে রে
তলে তলে চর হয়ে ফেরে ?'

এমন কী সেদিনের খোকা
আঙুল নাচিয়ে বলে, 'বোকা' !

সেই থেকে বোকা হয়ে আছি
শ্যাম বাজারের কাছাকাছি।

ছাতা

যেই উঠে দাঁড়াল সে-মেয়েটির বস্ত্রহীন দেহ
পিছনে দাঁড়ানো কার কব্জি থেকে ছাতা গেল খসে।

অবশ্য দুয়ের মধ্যে অন্য কোনো সংযোগ ছিল না
তবুও যুবক দুটি কেন বলে উঠল 'হায় হায়' ?

আমার পাশের বন্ধু কানে কানে বলে দিল ডেকে :
'এখন ট্রামের মধ্যে এসব হামেশা দেখা যায় !'

তা হোক। কেবল, এই কথাটা কি ভেবে দেখবেন,
ছাতা যদি খুলে ধরি মেয়েটি কি আড়ালে লুকোবে ?

কল্পনা

রেখেছি উড়ো হাওয়ায়
মিলিয়ে যায়
ধূপ
ও জাদুকল্পনা

অবসান সন্ধ্যাবেলায়
অবহেলায়
চুপ
কেউ কোনো কথা বলব না

হায় রে প্রণতিপাত
সবই বরাত

সবই তো বরাভজোর
পীর

পয়গম্বরেরা বড়ো বেশি
মুশকিল-আসান। দেশি বা বিদেশি
মহা সোর
সব মুখে গাজনের ভিড়।

ব্যাঙ

এ বাড়িতে
যা যা থাকা উচিত, সবই আছে
মাছ আছে পাখি আছে ফুল আছে।

তাছাড়া কুকুর আছে, যেটুকু দরকার আলো আছে, সিঁড়ির তলায়
অন্ধকারও আছে,
ঘরে ঘরে নানারঙা মোজেইক

সবই আছে ঠিক। আছে
পিতলদানিতে শোভা, ফ্রেমে বাঁধা হালফিল ছবি

আছে সবই। এমন কী ওরা দুজনেও
বেশ আছে
এত বেশি আছে যে জানে না বুকের মধ্যে কাঁচে

আসলে লাফায় বুড়ো ব্যাঙ।

মানুষ

মানুষ কী করে এত পারে ?

সত্য সে হয়নি বটে, তবুও সত্যের কাছে যেতে
চেয়েছিল। তাই জেনে ভালো ভালো জামা প'রে সব
ঘিরে ধরেছিল তাকে মানুষেরই মতো কটি লোক।
চশমাও ছিল চোখে, এমন কী হাতে পোর্টফোলিও,
তদুপরি দাঁত আছে, হেসে কথা বলে মাঝে মাঝে
মুখ থেকে লালা ঝরে চোখ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি পোকা
ব্যাগ থেকে নীল হয়ে ফুঁসে ওঠে দুধেপোষা সাপ।
দিনকে যে রাত করা কিছুই কঠিন নয় বুঝে
নিমেষে চোখের সামনে চুরি করে নিয়েছে পুকুর।
আর এরা দুই পায়ে—দুয়ের বেশি না—দাপাদাপি
ক'রে তার কাছে এসে বুক থেকে হাড় খুলে খায়
অবিকল মানুষেরই মতো কটি জামাপরা লোক :

মানুষ তবুও তার ভালোবাসা রেখে গেছে পায়ে।

দুই বাংলা

আমার এ দুটি কলুষমাখানো হাত
নিতে চেয়েছিলে তোমার বুকের কাছে,
তোমার দুখানি রক্তরাঙানো হাত
আমার মাথায় রাখো, মার্জনা করো।

একা

কী ছিল বয়স কী ছিল হৃদয়, তখন
পদ্মা আমাকে দিয়ে দিয়েছিলে বিদায়—
আজ মনে জানি তুমি নও তুমি নও
আমিই আমাকে ছেড়েছি মধ্যরাতে।

সেই অপরাধে, নুরুল, একলা তুই
আমাকে ফেলেই যুদ্ধে গেছিস চলে
সেই অপরাধে আজ বসে দেখি তোর
একার দুঃখ, একার মৃত্যু, জয়।

দেশহীন

আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই জয়
কিন্তু সেকথা বলা আমার সাজে না
আমার সমস্ত শরীর
তরুণ শষ্পের মতো উদ্‌গত করে দিয়ে বলতে চাই জয়
তবু গলায় ঠিক স্বর বাজে না
আমার মুখে অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত
আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি
তাই আজ যদি দুহাতে তুলতে চাই অভয়
কেঁপে যায় হাত, মনে পড়ে
এত দীর্ঘ দিন আমি কখনোই তোমার পাশে ছিলুম না
না
সুখে না দুখে না লাজে না
তবু তোমার সামনে আজ বলতে চাই জয়
যে কথা বলা আমার সাজে না।

বিবেক

নীল জল।
হঠাৎ ঝাপটি মাঝে মাঝে মাঝে খয়েরি শুশুক
ওই ওই রব ওঠে ওই ওই—
তার পর সব শান্ত নিরুদ্‌বেগ সবুজ পৃথিবী
ধোয়া তুলসীপাতা!

সত্য

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল যুবা
সঙ্ঘপ্রেমে ঝাপ্‌সা, বিক্ষত।
পথের ভিড়ে মুখ লুকিয়ে কাল এক
ভিখারি তাকে বলে গিয়েছে ডেকে:
'দিনের বেলা একলা ঘুরি পথে
রাতদুপুরে সঙ্ঘে যাই ফিরে
সঙ্ঘে আমি একলা থাকি বটে
একার পথে সঙ্ঘ টের পাই।
তোর কি আছে এমন যাওয়া-আসা
কর্মী, তোর জ্ঞানের বহু বাকি—
আমাকে তুই যা দিতে চাস ভুল
ফিরিয়ে নিই আমার ভাঙা থালা।
তা ছাড়া এই অবিমৃষ্য ঝড়ে
স্পষ্ট স্বরে বলতে চাই তোকে
সত্য থেকে সঙ্ঘ হতে পারে
সঙ্ঘ তবু পাবে না সত্যকে।'

চিতা

আজ সকাল থেকে কেউ আমাকে সত্যি কথা বলেনি
কেউ না
চিতা, জ্বলে ওঠো

সকলেরই চোখ ছিল লোভে লোভে মণিময়
মুখে ফোটে খই
চিতা, জ্বলে ওঠো

যা, পালিয়ে যা
বলতে বলতে বেঁকে যায় শরীর
চিতা

একা একা এসেছি গঙ্গায়
জ্বলে ওঠো

অথবা চণ্ডাল
দেখাও যেভাবে চাও সমীচীন ছাইমাখা নাচ।

যখন লোকে

গলির মুখে বিপদ, ঘর থেকে
ঝলক দেয় সরল তরবারি—
যখন লোকে একলা চলে, তখন
সরিয়ে নাও সমস্ত ঘরবাড়ি।

সবার পাশে সবার মতো ত্রাসে
মিলেছে এসে হাজার নরনারী—
যখন লোকে একলা চলে, তখন
সরিয়ে নাও সমস্ত ঘরবাড়ি।

শব্দ দিয়ে আগুন দিয়ে ঘিরে
বানিয়েছিলে অসীম সংসারী—
যখন লোকে একলা চলে, তখন
সরিয়ে নাও সমস্ত ঘরবাড়ি।

বিরলতা

তুমি আজ এমন করে কথা বলো মনে হয় শব্দ যেন শব্দের
সন্ন্যাসিনী

নীল বনপটভূমি ফলভরে নিয়ে যায় সৌরস্বভাবের দিকে
দায়হীন

পাশে আছো না কি নেই বোঝা যায় না পদধ্বনি থাকা-না-থাকার খুব
মাঝখানে

কমণ্ডলু হাতে নিয়ে অনায়াসে সরে যাওয়া হাওয়ায় যেমন জল
ধ্বনিময়

টলটল চলে যায় তোমার আপন স্বর, বিরল, বিরল হ্রদে
ভাসমান

বিরলতা আনন্দের বিরলতা পূর্ণতার, তবু যদি একবার
কথা বলো।

বৃষ্টিধারা

আমার মেয়েকে নিয়ে বুকজলে
যাবার সময়ে আজ বলে যাব :
এত দম্ভ কোরো না পৃথিবী
রয়ে গেল ঘরের কাঠামো।
ঝাপ্‌টা ঝাপসা করে চোখ
হাহাকার উঠেছে, তা হোক
রয়ে গেল মাটির প্রতিভা
ফিরে এসে ঠিক বুঝে নেব।
ভয় দেয় উদাসীন জল
মানুষের স্মৃতিও তরল
ঘোর রাতে আমাদেরই শুধু
বারে বারে করো ভিৎহারা ?
সকলেই আছে বুকজলে
কেউ জানে কেউ বা জানে না
আমাকে যে সহজে বোঝালে
প্রণাম তোমাকে বৃষ্টিধারা।

মূল ভাষা

যে যেভাবে আছে
        সে সেভাবে নেই।
থাকার মানেই যেন চুপিসাড়ে থাকা
শাদা চাদরের ঢাকা শব।

সভ্যতা বানানো বটে, কিন্তু সে তো
        যেমন বানায় ফুল, অথবা পুতুল :

যা ছিল না তাই উঠে আসা
রচনা করেছি মূল ভাষা।

আছে বটে দ্রুত বহু যান।
আমি যদি ক্রোশ ক্রোশ হেঁটে যাই, বেশ
তুমি কেন কেড়ে নিতে চাও
যখন যেভাবে আছি সেভাবে থাকার
আমার নিজস্ব অধিকার ?

কবিতার প্রসাধন

মুখর প্রচ্ছদ ভেঙে দেখা যায় না মুখের আদল
অধিকাংশ দিন।
শুধু
কখনো কখনো
স্নানশেষে ঘরে ফিরে এলে
হঠাৎ তোমাকে দেখে মনে হয় সেজে আছো খুব।

কথা

আমার অল্পই যাওয়া আমার অল্পই কথা বলা
সকালে ওদের সঙ্গে কথা বলি
দুপুরে ওদের সঙ্গে কথা বলি
রাতেও ওদের সঙ্গে রাতেও স্রোতের সঙ্গে কথা বলি কথা বলি কথা
আমার অল্পই কথা আমার অল্পই শ্রোতা পাওয়া।

ধর্ম

শোনো, আমি আজ এই ধর্মে বড়ো লাঞ্ছনা দেখেছি।
অর্থহীন পণ্ডশ্রম ভুল কিংবা ভুলের মাশুল
টবের মাটিতে জল বারান্দার কোণে জন্মহীন
খোলা রাজপথ জুড়ে শব্দের আঘাতে অপমান
শব্দের অনেক মানে কলরব নিষ্ফল বিস্তার
শব্দের অনেক মানে, তবু
আমাদেরও ধর্ম চাই প্রতিভাবিহীন অন্ধকারে।

যৌবন

দিন আর রাত্রির মাঝখানে পাখিওড়া ছায়া
মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমাদের শেষ দেখাশোনা।

ত্যাগ

আমি খুব ভুল করে এ-রকম বৃষ্টিময় দিনে
ঘর ছেড়ে পথে যাই, পথ ছেড়ে আমন্দ নদীর
নদী চায় আরো ত্যাগ পৃথিবীর সীমানা অবধি
ধারাময় হয়ে যায় আমাদের নির্ভার জীবন
যা-কিছু কলঙ্ক ছিল শূন্যে শূন্যে ধুয়ে যায় যেন
কেবল জলের ভারে মাথা নিচু করে বলে জবা :
    ও কি তবে ভুল ক'রে ঘরের বিষাদ গেল ভুলে ?

প্রেমিক

বহু অপমান নিয়ে কিছু-বা সম্মান নিয়ে আজ
শরীরসর্বস্ব হয়ে এসেছি বপনহীন নিশা—
ভোলাও ভোলাও তুমি মুছে নাও ক্ষাতমুখ, ক্ষত
ভোলাও শৈবাল এই ক্লীব আবরণ, অপব্যয়
শব্দ নয় কথা নয় জলের ঘূর্ণিতে ব্যথা নয়
ভোলাও এ আত্মময় পাতালপ্রোথিত শল্যপাত
ভোলাও লুণ্ঠন, আমি ফিরে আসি, একবার বলো
তোমার দেবতা নেই তোমার প্রেমিক শুধু আছে !

এতক্ষণ

সবাই যে-যার পথে ফিরে গেলে ঘোর রাতে নিজের দিকে ঘুরে বলি,
এতক্ষণ কার কাছে ছিলি
এর মুখে ওর মুখে তার মুখে যার মুখে যার-তার মুখে কেন
চুমু খাস
সবাই যে-যার পথে ফিরে গেলে মনে হয় আমার ফেরার আর
পথ নেই
এর দিকে ওর দিকে তার দিকে যার দিকে যার-তার দিকে কেন
চলে যাস
সবাই যে-যার পায়ে প্রেত হয়ে বেড়ে ওঠে শ্বাসকষ্টময় কোনো
ল্যাম্পপোস্ট
তাদের স্থবির রেখে নিজের ঘরের দিকে ফিরে আসি, বলি, ওঠো—
খোলো দ্বার
আর তুমি অগভীর ঘুম থেকে ভুল পায়ে উঠে এসে সবখানি
খুলে দাও
বলো, এইবার ভাবো, একবার ভেবে দেখো এতক্ষণ কার কাছে
ছিলে !

ঠাকুরদার মঠ

এইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে
ঠাকুরদার মঠ
চতুর্দশীর অন্ধকারে বুকের পাশে বাতি জ্বালিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি
একা
সবাই সব বুঝতে পারে কোন্ শেয়ালের কোথায় পথ পতনমুখে কীভাবে কে
হামলে দেয় গা
নিজের হাতে জ্বালিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি ছিল আমার তাই এখানে চুপ করে
দাঁড়াই
সবাই আমার মুখ দেখে না আমি সবার মুখ দেখি না
তবু তোমার মঠ ছেড়ে যাই না
চতুর্দশীর অন্ধকারে তোমার বুকে আগুন দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি
একা
এইখানে চুপ করে এইখানে ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে
ঠাকুরদার মঠ।

শরীর

শরীর যেভাবে ভয় পায়
শরীরের সমূহ সভায়
সেভাবে আমার দিন নিচু হয়ে এসেছে কিনারে
হয়তো নদীর জলে ডুব দিতে চায়

না কি এ শরীরই অস্ত যায়?

অঞ্জলি

ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়
সমস্ত মিলায়
এমন মুহূর্ত আসে যেন তুমি একা
দাঁড়িয়েছ মুহূর্তের টিলার উপরে, আর জল
সব ধারে ধাবমান জল
প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিতহীন
আর, তুমি একা
এত ছোটো দুটি হাত স্তব্ধ করে ধরেছ করোটি
মহাসময়ের শূন্যতলে –

জানো না কখন দেবে   কাকে দেবে   কতদূরে দেবে !

রেড রোড

খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছি ময়দানের গভীর তলদেশে
যেন নক্ষত্র তুলে নেয় আমার নিভৃত নিশ্বাস

এই অন্ধকার মণ্ডলের গহন থেকে আমার শব্দহীন স্তব
যেন পুঞ্জে পুঞ্জে উঠে যায় স্বর্গীয় ঈথারে

আমাকে ভুল বুঝো না ব'লে দুহাত ছড়িয়ে দিতে টের পাই
চোখের ঢালু বেয়ে নম্র ঘাসের মতো ক্ষীণ জলরেখা

অল্পে অল্পে প্রাণ পেয়ে কেঁপে ওঠে হাওয়ায়
জানি না বুকের কত নিচে নেমে যায় এর সর্বপায়ী শেকড়

কপালে হালকা পালক ছুঁয়ে বলে যায় রাত্রি :
এই মাটি তোমার শরীর, একে স্পর্শ করো, জানো—

আর অমনি দশ দিগন্ত ভেসে যায় উপচে পড়ে দুচোখ
স্ফুরিত আনন্দে না কি দিশাহীন জলে

তারই পাশে রুল হাতে এগিয়ে আসে পুলিশ, বলে : ওঠো
অবৈধ তোমার এই একলা অসামাজিক শুয়ে থাকা—

আবার আমি নিচু হয়ে পায়ে পায়ে চলতে থাকি শহরের দিকে
সামনেই ঝকঝকে রেড রোড।

মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রিয়বরেষু

নির্বাসন

আমার সামনে দিয়ে যারা যায়, আমার পাশ দিয়ে যারা যায়
সবাইকে বলি : মনে রেখো

মনে রেখো একজন শারীরিক খণ্ড হয়ে
ফিরে গিয়েছিল এই পথে

বালকের মতো তার ঘর ছিল বিষণ্ণের
দুপুর আকাশে ছন্নছাড়া

চোখে তার জল নয়, বুকের পিছনে দিঘি
ভাঙা বাড়ি প্রাচীর আড়াল

শতাব্দীর ঝুরিনামা গাছের নিবিড়ে ওই
ব্যবহারহীন জল থেকে

একজন দেখে – দূরে – কখনো দেখেনি আগে
এমন আনন্দমুগ্ধ দেশ

এমন আপনমুগ্ধ ঢল নামে, তার পাশে
এমন শরীরসঙ্গহারা

হয়তো-বা একজন ধর্মহীন বর্মহীন
নির্বাসনে যায়, মনে রেখো।

শরীর

শরীরের মধ্যে কিছু একটা ঘটছে, ডাক্তার
ঠিক জানি না
কীভাবে বলতে হয় তার নাম

আয়নার সামনে বসলে ভারি হয়ে নামে চোখ
পেশির মধ্যে ব্যথা
ভিতর থেকে ফুটে বেরোয় হলুদ রঙের আলো

কিন্তু সে তো গোধূলির আভা।   রক্তে কি
গোধূলি দেখা যায় ?
রক্তে কি গোধূলি দেখা যায় ?   যাওয়া ভালো ?

শরীরের মধ্যে কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে, ডাক্তার
জানি না তার নাম।

খরা

সব নদী নালা পুকুর শুকিয়ে গিয়েছে
জল ভরতে এসেছিল যারা
তারা
পাতাহারা গাছ
সামনে ঝলমল করছে বালি।

এইখানে শেষ নয়, এই সবে শুরু।
তারপর

বালি তুলে বালি তুলে বালি তুলে বালি
বালি তুলে বালি

বিশ্বসংসার এ-রকম খালি
আর কখনো মনে হয়নি আগে।

পতঙ্গ

    কিছু পতঙ্গ   উড়ে এসেছিল   আমার মাথার
        ভিতরে সে ছিল
ঝোড়ো পতঙ্গ   উড়ো পতঙ্গ
        বীজাণুর চেয়ে   গুঁড়ো পতঙ্গ
    খুঁড়ে খুঁড়ে এই   খুলি খুলেছিল   ঘুণ ঘুণ ঘুণ   কুরে খেয়েছিল
আমার ভিতরে   যা-কিছু-বা ছিল   সহসা সাহসে
        ভর করে এসে
সব খুঁড়েছিল   দলে দলে যত   হীন পতঙ্গ   গুঁড়ো পতঙ্গ
    উড়ে এসেছিল   আমার মাথার
        ভিতরে সটান   কিছু পতঙ্গ
                উড়ো।

না

এর কোনো মানে নেই। একদিনের পর দু'দিন, দু'দিনের পর তিনদিন
কিন্তু তারপর কী?
একজনের পর দু'জন, সুজনের পর দুর্জন
কিন্তু তারপর কী?
এই মুখ ওই মুখ সব মুখ সমান।

তুমি বলেছিলে ঘর হবে, ঘর হলো
তারপর কী ?
তুমি বলেছিলে স্নেহ হবে, স্নেহ হলো
তারপর ?
কতদূরে নিতে পারে স্নেহ ?   অন্ধকারও আমাকে সন্দেহ
করেনি কখনো
বুকে বসে আছে তার এত বড়ো প্রতিস্পর্ধী কোনো !

না-এর পর না, না-এর পর না, না-এর পর না
তারপর কী ?
পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা
তারপর ?

আউট

এইখানে এসে দাঁড়াই
চারদিকে হাজার হাজার ঝকঝকে চোখ

মানুষের
অন্তত মানুষেরই মতো

পালাবার পথ নেই কোনোদিকে
এগিয়ে আসে চোখ, হাজার হাজার

হাঁটুর মধ্যে জলস্রোত, খসে পড়ে গাছ
আমার হাতে কোনো সুষমা নেই কোনো ছন্দও নেই আর

এ-কোন্ প্রাংশুলভ্য উন্মাদ তাথৈ থৈ থৈ
আউট

আউট আউট ব্রীফ ক্যাণ্ডল
আউট

বলতেই চারদিকে শুরু হয় মানুষের ঝনঝন নাচ!

এপিটাফ

প্রচ্ছদ পড়ুক চোখে, শান্ত হোক শিরা
ভুলুক দিনের যত সমবেত ভুল
দুঃখ রেখে যাক মুখে চন্দনপ্রলেপ
ফিরে যাক এসেছিল যে-প্রতিবেশীরা
পায়ে শুধু পড়ে থাক স্তব্ধ এলোচুল।

আঙুল

এইসব আঙুলের পাশাপাশি আর কোনো ঝাউ নেই আজ।
আঙুল দেখেছি খুলে, খোলে না সে বহুদূর, আর
ছোঁয় না চিবুক
গোধূলিতে ভরে ওঠে বুক
অথচ দিগন্ত থেকে আনে না সে রক্তিম প্রতিভা
তোমার কপালে তুলে দিতে
তোমার কপাল থেকে সরে যায় সিঁদুরের গুণ
এইসব আঙুলের শেষ শব্দ শোনা যায় পাটখড়ি ভাঙা
কিছুদূরে রাত্রি হয়, আর
আর তার পাতাঘরে চুপিসাড়ে অন্ধকারে জলে চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ

বর্ম

'ও যখন প্রতিরাত্রে মুখে নিয়ে এক লক্ষ ক্ষত
আমার ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ফিরে আসে ঘরে
দাঁড়ায় দুয়ারপ্রান্তে সমস্ত বিশ্বের স্তব্ধতায়
শরীর বাঁকিয়ে ধরে দিগন্তের থেকে শীর্ষাকাশ
আর মুখে জ্বলে থাকে লক্ষ লক্ষ তারার দাহন
অবলম্বহীন ওই গরিমার থেকে ঝুঁকে প'ড়ে
মনে হয় এই বুঝি ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন দেহ
মুহূর্তে মূর্ছিত হলো আমার পায়ের তীর্থতলে—
শূন্য থেকে শূন্যতায় নিরাকার অস্ফুট নিশ্বাস
মধ্যযামিনীর স্পন্দে শব্দহীন হলো, তখনো সে
দূর দেশে দূর কালে দূর পৃথিবীকে ডেকে বলে :
এত যদি ব্যূহ চক্র তীর তীরন্দাজ, তবে কেন
শরীর দিয়েছ শুধু, বর্মখানি ভুলে গেছ দিতে !'

কুঠার

নিচু মাথায় চলেছে ওই লোক
চোখের পাতা ঠিক দেখা যায় না
হয়তো কোনো ভাবনা আছে মনে
হয়তো খুবই শূন্য হয়ে আছে
আমার নিচে অনেকদিনের কুঠার
মমতাহীন বীভৎস দস্যুতার
হয়তো অনেক চিহ্ন রেখে গেছে
মিথ্যে ওকে দিয়ো না আর শ্লোক
নত মাথায় শক্ত পায়ের পাতায়
শব্দবিহীন ঝরে অস্তালোক।

স্পর্ধা

তার কোনো খ্যাতি নেই তার জন্মপরিচয় নেই
তার কোনো মুক্তি নেই লোকে যাকে মুক্তি বলে থাকে
যতদূর দেখা যায় সারি সারি কম্বল, পশম
আর কোনো ঢেউ নেই ঢেউয়ের সংঘর্ষে দ্যুতি নেই।
জীবন এত যে ভালো, সে-জীবনে অধিকার নেই
লজ্জাহীন সুন্দরের মুখে কোনো ম্লান আভা নেই
সারি সারি উট আর উটের চোখের নিচে জল
দু'হাত বাড়িয়ে দেখে আর কোনো জলচিহ্ন নেই—
তবু সে এমনভাবে কোন্ স্পর্ধা করে বলে যায়
'আমার দুঃখের কাছে তোমাদের নত হতে হবে!'

ছায়া

'সকলেরই মুখে এত ছায়া কেন' ব'লে
মুছে নাও ছায়া
আর দেখো, ছায়া
হয়ে ওঠে আরো বেশি কৃকলাশ পিশাচিনী ছায়া
গুহার কালিমা থেকে বলে ওঠে : বেহদ্দ বেহায়া
কেন এই ছায়া তুলে দেখে নাও শেষহীন ছায়ার ভিতরে এত
ছায়ায় আমার আরো ছায়া?

পুনর্মিলন

কী কথা বলে ওরা ?   কোনো কি কথা বলে ?
এ ওকে চোখে চোখে কখনো দেখেছে কি ?
এসেছে কাছাকাছি, দূরেও গেছে চলে —
কোথায় যায় ওরা ?   শুধু কি আসা-যাওয়া ?

ভিতরে কাঁপে জিব, বাইরে ঠোঁট ভার
কচিৎ সিগারেটে যে-যার লোভ দেখে
একাই বসে-থাকা অনেকে পাশাপাশি
সামনে কামরাঙা নিভৃতি ঝোপঝাড় !

তাহলে ওঠা যাক ?   অনেক রাত হলো ।
এ ওর হাতে হাত ।   হঠাৎ কোণ থেকে
গোপন গর্তের কেউটে জেগে ওঠে :
কোনোই কথা নেই, কেবলই দেখাশোনা ।

কোনোই কথা নেই ?   কেবলই দেখাশোনা ?
কথা কি ছিল কোনো ?   ছিল না কোনো কথা ।
ঘিরেছে কামরাঙা, কেবলই ফিরে যাওয়া —
বিগত বন্ধুতা, বিদায়, বন্ধুতা !

সস্তুতি

আবার ফিরে আসে এ-রকম নিজের মধ্যে ভরে-ওঠা দুপুর
যখন মাথার উপর নিকষকালো মেঘ
আর অগাধ পাটখেতের কিনার ঘিরে আমাদের নিঃশব্দ চলা

ছমছমে প্রান্তর জুড়ে খেলনা দুই মানুষ
ভেসে ওঠে সুখে দুঃখে অস্পষ্ট অতীত দিন নিয়ে
ভয়ে ভয়ে সরে আসে শস্যের পাশাপাশি খুব

কেননা এই সুখ এই দুঃখ এই আকাশ
আমাদের ছিঁড়ে নেয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যথাময়
গ্রামান্তের দিকে

শুধু ধরা থাকে হাত
হাতে হাতে কথা নেই কোনো
চোখে চোখ রাখি তবু কেউ কাউকে দেখতে পাই না আর

এ কি মৃত্যু ? এ কি বিচ্ছেদ ? না কি মিলনেরই অপার বিস্তার ?
এ কি মুহূর্ত ? এ কি অনন্ত ? না কি এরই নাম সন্তত জীবন ?

আমাদের মাঝখানে প্রথম বৃষ্টির বিন্দু নীল
আর তুমি নিচু হয়ে তুলে নাও একমুঠো মাটি

শূন্যে ছড়াও, আর চোখে চোখে না তাকিয়ে বলো :
ভেবো না। ভেবো না কিছু। দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে .

প্রতিভা

ক্রমে এনে দেব তোকে স্ফীত মুণ্ড, স্নায়ুহীন ধড়
থাবায় লুকোনো বহু বাঘনখ, লোমশ কাকুতি
চোখের প্রতিটি পক্ষ্মে এনে দেব ধূর্ত শলাকা-র
ক্ষিপ্র চলাচল, আর, জল নয়, লালা দুই চোখে।
হৃৎপিণ্ডে বেঁধে দেব কারুকার্যে পাথরের ঢাল
মেরুদণ্ডে গলে-যাওয়া সরীসৃপ-আভা, আর স্বরে
সহজে বাজিয়ে দেব নবমীর ন-হাজার ঢাক—
তারপরে বলে দেব— আ, এই প্রতিভা আমার,
যা, শহরের পথে অকাতরে ঘোর্ এইবার !

জয়োৎসব, ১৯৭২

ধরা-পড়া ক'টা শূকর এখন
ঝল্‌সে নিচ্ছ আগুনে
        ফাল্গুন, এই নূতন জয়োৎসব !

চোখ থেকে নামে সরীসৃপ বা
রাত্রিও হলো মানুষহীন
        ফাল্গুন, এই মাতাল মহোৎসব !

চেপে ধরে রাখা চিৎকার, আর
কেঁপে ওঠে পেশি শেষবার.
        ফাল্গুন, এই অমোঘ জয়োৎসব !

উপ্‌চে উঠছে সব ভাঁড়, আজ
মতিলাল আর জব্বার
হাতে-হাত নাচো নগ্ন মহোৎসব !

স্বৈরিণী

মনে রাখিস না ?   এত দিইথুই ?
থেকে-থেকে শুধু প্রশ্ন পাঠাস
'সুখী না কি তুই ? দুঃখী কি তুই ?

'ও-সুখদুঃখ কার-বা ? শোন্—
স্বৈরিণী ঠোঁট এই তো বাড়াই
আয় ছেড়ে আয় নির্বাসন !'

দিন কেটে যায় একলা পাথর
বইতে বইতে পাহাড়চুড়ায়
তবু জানি মনে পড়বে না তোর।

সবার সঙ্গে দল বেঁধেছিস
চারদিক জুড়ে বেলেল্লা নাচ
কেউ কাটে ছড়া কেউ দেয় শিস্

ভাবনাও নেই ভাসার ডোবার
রঙ্গিণী তোর সমস্ত গা-য়
উপচে পড়ছে আনন্দভার

আর, আমার যে পাথর টানতে
দিন কাটে, তুই তার দিকে চেয়ে
বিদ্যুৎ দিস্ চোখের প্রান্তে :

'ও-সুঃখদুঃখ কার-বা ? শোন্—
রঙ্গিণী ঠোঁট এই তো বাড়াই
আয় ছেড়ে আয় নির্বাসন !'

এ-বসন্তে

মানুষের চারধারে মানুষ
হেঁটে চলে যায়
মানুষের চারধারে মানুষ
হামাগুড়ি দেয়
দেখাশোনা হতে থাকে, লাভ-লোকসান
ক্ষয়ক্ষতি
মানুষের চারধারে মানুষ   বড়ো বেশি
লাঙুল তুলেছে এ-বসন্তে !

শাদাকালো

পথের ওই খুনখুনে বুড়ো
যখন এগিয়ে এসে বলে 'আমি চাই ।
দেবেন না ? না দিয়ে
কাকে ঠকাচ্ছেন মশাই ?'
আর চারদিক থেকে ভদ্রলোকেরা :
'সাবধান, সরে যান
লোকটা নির্ঘাৎ টেনে এসেছে
কয়েক পাইট'

তখন আমার সামনে কেঁপে দাঁড়ায়
ওয়াশিংটনের আরেক মস্ত বুড়ো
থুত্থুরে
ছেঁড়া বুকে ঢিল খেতে খেতে
তবু যে আঙুল তুলে বলেছিল 'শোনো
আই অ্যাম ব্ল্যাক
ও ইয়েস, আই অ্যাম ব্ল্যাক
বাট্ মাই ওয়াইফ ইজ হোয়াইট !'

ইন্টারভিউ

এই মাংসের স্বাদ খুব চেনা
চিবুক বেয়ে গড়িয়ে নামে ঝোল
অপেক্ষার পর অপেক্ষা
অপেক্ষার পর অপেক্ষা
তারপর বুঝতে পারি এ-রকমই হয়
আমার বোনেরা যেখানে ইন্টারভিউ দিতে যায়
সেখানে আমিই
আরেকরকম পোশাকে
গরম ভাপ নিতে নিতে
তাদের খাব বলে চুপ করে বসে থাকি
শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে।

গ্রাম থেকে একজন

হে ধর্ম, ধর্মাধিপতি, তুমি যদি একবার এসে
বলে দিয়ে যাও শুধু কত ধানে কত চাল হয়
তাহলে হয়তো আরো কিছুদিন টিকে যেতে পারি
ভারিক্কি গম্ভীর চালে হতে পারি বয়স্ক বাঁদর
একে ওকে ঝাপ্‌টা দিয়ে চলে যেতে পারি, ভেবে দেখো
এ জীবন কেটে গেল কতখানি বোকাসোকা হয়ে
চালাক বাবুরা তাই ফিরেও দেখে না, জানে না যে
কত লোক আছে যারা ঘুঘুও দেখেনি ফাঁদও নয় !

চালচলন

এটা নতুন ধরন
যত নপুংসকের
নির্- বীর্যীকরণ !

সারা শহর জুড়ে
দেখে বালা-বালকে
নির্- লজ্জ নিশান
ওড়ে সূর্যালোকে
আজ সবাই মিলে
মাতে মহোৎসবের
লাল হলুদ নীলে
আর পরশুরামের
ভীম কুঠার হাতে
গায় দু'হাত তুলে
চাই সৃষ্টিহরণ

চাই			স্বষ্টিহরণ
সারা			শহর জুড়ে
চাই			স্বষ্টিহরণ
যত			নপুংসকের
নির্-			বীর্যীকরণ !

হাসপাতাল

নার্স ১

ঘুমোতে পারি না, প্রতি হাড়ের ভিতরে জমে ঘুণ
পা থেকে মাথায় ওঠে অশালীন বীজাণুবিস্তার
ঘূর্ণমান ডাক দিই : কে কোথায়, সিস্টার সিস্টার—

'হয়েছে কী ? চুপ করে নিরিবিলি ঘুমিয়ে থাকুন।
তাছাড়া নিয়মমতো খেয়ে যান ফলের নির্যাস—'
শাদাঝুঁটি লাল বেল্ট খুট খুট ফিরে যায় নার্স।

নার্স ২

রাত দুটো। চুপিচুপি দুটি মেয়ে ঢুকে দেখে পাশের কেবিনে
ম্রিয়মাণ যুবাটির আরো কিছু মরা হলো কি না।

'এখনো ততটা নয়' ঠোঁট টিপে এ ওকে জানায়।
'তবে কি ঘুমোচ্ছে ? না কি জ্ঞানহীন ? ডাক্তার দরকার ?'

'থাক্ বাপু'—ফিনফিনে ফিতে দুটি ফিরে চলে যায়
'আমরা কী করতে পারি ! যার যার ঈশ্বর সহায় !'

নার্স ৩

দু'জন আছেন ওই অ্যাপ্রনসুন্দরী
অ্যাপ্রনের নিচে রেখে হাসি
মুখে মরুভূমি নিয়ে নিয়মিত ভোরে
বিছানা সাজান বারো মাসই
যদি বলি 'চাদরের আমিও কোণ ধরি'
আমাকে দেবেন ঠিক ফাঁসি !

নার্স ৪

হাসিও ছিল বারণ
মুখে তাকাই না, কারণ
তাকালে মুখে রোগীর বুকে
রক্ত-সমুৎসারণ !

ধরেছি বটে নাড়ী,
কপাল ছুঁতে কি পারি ?
এক ঝাপটে-এ মাথায় ওঠে
ছেলে থেকে বুড়ো ধাড়ি ।

পায়ের নিচে একটুকরো খাবার

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা ।

ঠোঁটের থেকে পড়ছে ঝরে ঝরে —
অন্ত ধারে গিয়ে খাবার খা না ।

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা ।

খুব বিরক্ত করছিল কি তোকে?
বড়োই বেশি করছিল বাহানা?

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা।

দিস্ নি, ভালো, দিলেই হতো ভুল
লোভ বাড়াতে শাস্ত্রে আছে মানা।

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা।

তোর দয়াতে হয়তো পেত ভয়
চেঁচিয়ে উঠে বলত 'না-না, না-না'

বিস্ফোরণে ফাটত হঠাৎ দানা
বাংলা থেকে কিউবা থেকে ঘানা।

সমাজসেবক

সমাজ পালটাও! সমাজ পালটাও!
সমাজ ছাড়া কোনো কথা নেই।
(কী বাবা! এইখানে? এমন মানীগুণী
আমার ঠাঁই হলো বাগানে?)

সমাজ পালটাও। একে যে কুরে খায়
মধ্যবিত্তের ভাঁওতা
যা-কিছু ক্ষীরননী দু'হাতে নিয়ে যায়
নিজেরা নিজেদের আওতায়।

আহ্লে বাবুদের হাজার কলকাঠি
প্রকাশ করে দাও ক্রমশ—
(হে বাবা! ততদিনে গোপন মসজিদে
আমার হয়ে যাক প্রমোশন !)

বাবুমশাই

আশা করি সকলেই বুঝবেন যে এই ধরনের
রচনা পড়বার বিশেষ একটা সুর আছে।

'সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা।'
বেঁচে ছিলাম বলেই সবার কিনেছিলাম মাথা
আর তাছাড়া ভাই

আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ; চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে
যাবে খোল-নলিচা

যাবে খোল-নলিচা পালটে, বিচার করবে নিচু জনে'
—কিন্তু সেদিন খুব কাছে নয় জানেন সেটা মনে
মিত্র বাবুমশয়

মিত্র বাবুমশয় বিষয়-আশয় বাড়িয়ে যান তাই,
মাঝেমধ্যে ভাবেন তাদের ঘুম আনতে পান্তাই
নিত্য ফুরোয় যাদের

নিত্য ফুরোয় যাদের সাধ-আহ্লাদের শেষ তলানিটুকু
চিরটা কাল রাখবে তাদের পায়ের তলার কুকুর
সেটা হয় না বাবা

সেটা		হয় না বাবা' ব'লেই থাবা বাড়ান যতেক বাবু
		কার ভাগে কী কম পড়ে যায় ভাবতে থাকেন ভাবুক
অমনি		দু'চোখ বেয়ে

অমনি		দু'চোখ বেয়ে অনর্গলে ঝরে জলের ধারা
		বলেন বাবু 'হা, বিপ্লবের সব মাটি সাহারা'
কুমির		কাঁদতে থাকে

কুমির		কাঁদতে থাকে 'আয় আমাকে মামা নামা' ব'লে
		কিন্তু বাপু আর যাব না চরাতে-জঙ্গলে
আমরা		ঢের বুঝেছি

আমরা		ঢের বুঝেছি খেঁদীপেঁচী নামের এসব আদব
		সামনে গেলেই ভবে মুখে, প্রাণ ভরে তাই সাধো
তুমি		সে-বন্ধু না

তুমি		সে-বন্ধু না, যে-ধুপধুনা জ্বলে হাজার চোখে
		দেখতে পাবে তাকে, সে কি যেমনতেমন লোকে
তাই		সব অমাত্য

তাই		সব অমাত্য পাত্রমিত্র এই বিলাপে খুশি
		'ভাঁড়িখানাই কেবল সত্য, আর তো সবই ভুষি
ছি ছি		হায় বেচারা !'

ছি ছি		হায় বেচারা ? শুনুন যারা মস্ত পরিত্রাতা
		এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা
হেঁটে		দেখতে শিখুন

হেঁটে		দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়
		আরেকটা কলকাতায় সাহেব আরেকটা কলকাতায়
সাহেব		বাবুমশায় !

পাগল হবার আগে

ফুলবেলপাতা ভ্যাভাং ভ্যাং
ঘনকাসুন্দি ভ্যাভাং ভ্যাং
দিন যদি তার চোখ শুষে নেয়
রাত্রিবেলায় মাথায় ব্যাং।

ছাপোষা ছাপ্পা ধে ধে রে খাপ্পা
বুঝে গিয়েছি হে বেবাক ধাপ্পা
মাথার ভিতরে উলটে গিয়েছে
তিনচারজোড়া গোরুর ঠ্যাং।

কাটা-কাটু-কাটু আরে আকাট
এই ডান-কাৎ এই বাঁ-কাৎ
দিনদুপুরে-যে সবই ডাকাত
জবর গ্যাং!

ফুলবেলপাতা ভ্যাভাং ভ্যাং
ঘনকাসুন্দি ভ্যাভাং ভ্যাং
ছড়িয়ে গিয়েছে আসল গ্যাং
অহো রে শহরে গ্যাঙরগ্যাঙ।

এদিক-ওদিক

এদিক কিছু লক্কা পায়রা
ওদিক কিছু ঝাণ্ডা
মধ্যিখানে উচিতমতো
আত্মা হলেন ঠাণ্ডা।

উথলে ওঠে অন্নপ্রাশন
ওলটপালট তাণ্ডব
উপায় নেই যে পালিয়ে যাই
জাল বড়ো প্রকাণ্ড !

রাজপথে দিই জয়ধ্বনি
ধন্যি রাজার পুণ্যি —
মানতেই হয় বাজার থেকে
এখনো তেল নুন নিই।

ঝুলতে থাকে শিরদাঁড়া তাই
চলতে থাকি বান্দা —
পাশের ঘরে মরচেপড়া
আদ্যিকালের রামদা।

এই শহরের রাখাল

গোরুর পিঠে উঠবে বলে দৌড়েছিল যুবা
খোলা পথের উপর
লোকে বলল পাগল, লোকে বুঝেও নিল মাতাল
তা বলে ··· ভরদুপুর ··?

দুপুরবেলাই ? বাঁধো ওকে ! মাথায় ঢালো জল
হাতে পরাও বেড়ি !
'বেড়ি ? না কি রুপোর মালা ?' ব'লে যুবক সবার
ঠিক করে দেয় টেরি।

ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল সবাই 'এইরকমই হবে,
আকাল, মশাই, আকাল!'
গোরুর পিঠে দাঁড়িয়ে যুবা বলে 'এবার আমিই
এই শহরের রাখাল।'

শব্দের প্রকৃত বোধ

শব্দের প্রকৃত বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে বহুদিন
তাই, তুমি ডাকো, আমি শুনেও শুনি না, মানে নেই—
কে কাকে কী কথা বলে, কে শোনে কে না-ই শোনে, তবু
ভয়াবহ শব্দধূমে ভরে গেছে পৌষের বাতাস।
আর সেই অবসরে কোনো কোনো পিশাচ স্বাধীন
শীতের কুহর থেকে শুষে নেয় পৃথিবীর শাঁস
রাজপথ থেকে নারী তুলে নিয়ে চলে যায় ট্রাকে
ধাবমান চাকা থেকে ছিন্ন ওই পড়ে থাকে আয়ু
আজকাল কবিমাত্রে অনায়াসে সন্ধ্যা বলে যাকে—

শব্দের প্রকৃত বোধ কুয়াশায় একা পড়ে থাকে!

ঘরে ফেরার রাত

দেখেছি পথে যেতে, চলেছে হামা দিয়ে
বৈধাবৈধের লক্ষ চুম্বন
মিলেছে শহরের যুক্ত নাভিতটে
লুপ্ত পাঁচ মাথা : নষ্ট চুম্বন
মানুষ নামে ওঠে মানুষ মাঝখানে
দশটা পাঁচটার ভ্রস্ত চুম্বন

কেবিনে পর্দায় গভীর ময়দানে
মুখ না মুখোশের শুষ্ক চুম্বন
এখানে কফি হাতে ওখানে জটলায়
বামন চায় চাঁদে খুচরো চুম্বন
এ-ওকে ধ্বংসের ভিতরে উত্থান
কর্তৃপদে তাই তুখোড় চুম্বন
হঠাৎ-পতনের শায়িত খোলা বুকে
জনতা তোলে খর নখর, চুম্বন
'থামাও, বাঁধো, ধাও' ধ্বনির গহ্বরে
লরি ও ট্যাক্সির প্রখর চুম্বন

শরীর ফেরে তবু, যদিও কৃকলাশ,
চোখের পাতা চায় চোখের চুম্বন।

রূপ

যা মেঘ যা উড়ে যা
কিশোরী রূপপুরে যা

কেন আসিস মরতে
আমার ঘরের গর্তে

গর্ত তো নয় ছাউনি
কেউ আমাকে চাও নি

কেউ দাও নি বাঁচতে
যাও চলে যাও আস্তে

যা মেঘ যা দূরে যা
সমস্ত রূপ পুড়ে যা

তিমির বিষয়ে দু'টুকরো

আন্দোলন

ময়দান ভারি হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া ?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।

নিহত ছেলের মা

আকাশ ভরে যায় ভস্মে
        দেবতাদের অভিমান এইরকম
আর আমাদের বুক থেকে চরাচরব্যাপী কালো হাওয়ার উত্থান
এ ছাড়া
আর কোনো শান্তি নেই কোনো অশান্তিও না।

বড়ো বেশি দেখা হলো

বড়ো বেশি দেখা হলো যা-দেখার পাপে শরীরের
রক্তে রক্তে ভরে যায় ঘ্রাণহীন নীরক্ত কালিমা।
যদিই বাঁচাতে চাও দুই চোখে ঘষে দাও তুঁতে
চোখের তারায় দাও তরবারি উদ্দাম লবণ
জ্বালাও গন্ধক ধূম হলাহল ধ্বংস করে দাও
চেতনা চৈতন্য বোধ লুপ্ত করো অনুভব স্বাদ
শিরায় ছড়াও আর্দ্র ধারাময় সরীসৃপ দাহ
কটাহে ঘোরাও দণ্ড অক্ষিপট ঝিল্লি কনীনিকা
ছিন্ন করে নাও ছিন্ন অন্ধ করে দাও দুই চোখ
বড়ো বেশি দেখা হলো ধর্মত যা দেখা অপরাধ !

তুমি

আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই
আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই
কিন্তু আমার ভালো লাগে না যদি ঘরে ফিরে না দেখতে পাই
তুমি আছো, তুমি।

পালা

পালিয়ে যাওয়া? পালিয়ে যাওয়াই। পালা
শহর ছেড়ে সঙ্ঘ ছেড়ে পালা
গোলদিঘিতে মাছ উঠেছে, পালা
বখরা নিয়ে লেগেছে গোল, পালা
চোখের দিকে তাকাস না, চোখজ্বালা
লক্ষ্মী ফেলে গেছে হাতের বালা
পালা এবার দৌড়ে পালা, পালা
বিপ্নে ছেড়ে সিদ্ধি ছেড়ে পালা।

গঙ্গাযমুনা

আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের
আর সবই আমার কবিতা, কেবল এইটে তোমার
আর সবই থামা থেমে-যাওয়া চোয়ালে-চোয়াল-জাগা উচ্চাশার ঝুল লাগা
নেমে যাওয়া ভাঙা বর্ষার প্লাবনশেষে ম্যানহোল থেকে তোলা অন্ত্রময়
ভয় আর ধ্বস্তদেহ ফেলে রেখে ছুটে যাওয়া টায়ার টায়ার
ব্রিজ ধ্বস্

আর সবই শহরের কবিতা, কেবল এইটে প্রান্তরের।

আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের
আর সবই আমার কবিতা, কেবল এইটে তোমার
এইটে উপচেপড়া পূর্ণ টান সমুদ্রের কী কী যেন বাকি ছিল ব্যথা দেওয়া হলো
    কাকে অকারণে একদিন হাঁটুজল ভেঙে চলে যাওয়া বসন্তের উড়ো চুল
    হাসাহাসি করে লোকে নিচু হয়ে বুকে নেওয়া সমস্ত পথের ধুলো
    হাজার হাজার পাতা উড়ে যাওয়া আসন্ন ঈশান
আর সবই গঙ্গার কবিতা, কেবল এইটে যমুনার।

মীমাংসা

কিছুই মীমাংসা নয়, কোনোখানে নেই কোনো শেষ
হাতে তুলে নিয়েছ যে ফল
নিমেষে তা ঝরে যায় বাতাসবিহীন অন্ধ ঘরে

যা নেয় তা ফিরে দেয় মাটি
আমার কপালে শুধু রেখে যায় পরাভব
শরীর জাগিয়ে বারবার

হাত রেখে অগাধ শরীরে
বলে উঠি, দাও
দাও ফিরে সামঞ্জস্য পরিণতি সজীব সমাধা

ফিরে আসে ব্যর্থ হাত শিরায় শিরায় ছন্নছাড়া
কিছুই মীমাংসা নয়, সেই শুরু, যাকে ভাবো সারা।

মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়

ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো ?
চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব ?

মনে হয় ফিরে এসে স্নান করে ধূপ জেলে চুপ করে নীলকুঠুরিতে
বসে থাকি ?

মনে হয় পিশাচ পোশাক খুলে পরে নিই
মানবশরীর একবার ?

দ্রাবিত সময় ঘরে বয়ে আনে জলীয়তা, তার
ভেসে-ওঠা ভেলা জুড়ে অনন্তশয়ন লাগে ভালো ?

যদি তাই লাগে তবে ফিরে এসো। চতুরতা, যাও।
কী-বা আসে যায়

লোকে বলবে মূর্খ বড়ো, লোকে বলবে সামাজিক নয় !

বৃষ্টি

আজ ধ্বংস হয়ে যাবে সমস্ত যৌবন
আজ রাত্রে ধ্বংস হবে প্রেম

ছয় রিপু ছয় ঋতু লুপ্ত হয়ে যাবে
নিঃসঙ্গ প্রান্তর জুড়ে বৃষ্টি হবে আজ

পিচ্ছিল মন্দিরচূড়া, প্রাচীনতা— আর
এই শেষ সর্বনাশধারা

আমার শরীর, তার ধৌত অবশেষ
থেকে যাবে এই অন্ধ প্রান্তরসীমায়

আমূল প্রপাত ভেঙে হিম নিশ্চলতা
আমার শরীরে আজ ধর্ম হয়ে যায়।

অন্ধকার

অন্ধকার করো, গান, অন্ধকার করো দুই চোখ
বৃষ্টি করো, গান, আজ বৃষ্টি করো শেষ অন্ধকারে
মিথ্যা শেষ হয়ে যাক, শেষ হোক আলোর চাতুরি
একজন সত্য বলে, অন্ধকারে সত্য কথা হোক।
তুলে নাও, গান, তুলে নাও এই মর্মের মজ্জায়
সমস্ত সারাৎসার অন্ধকার তুলে নাও, আর
বৃষ্টি করো দেহময় অন্ধকার করো ধারাময়
মিথ্যা ধুয়ে যাক মুখে, গান হোক বৃষ্টি হোক খুব।

সন্ন্যাসী হয়েছে হাওয়া

আসলে সময় ছিল আমাদের কাকাতুয়া পাখি
কিছু কাজ, গম্ভীরতা, চলনবলন, ছদ্ম ঝুঁটি
অনায়াস ছেলেখেলা দূর থেকে মিলায় কাকুতি
সমস্ত কলকাতা আজ বিদ্যুৎবিহীন অন্ধ আঁখি
আসলে সময় ছিল আমাদের কাকাতুয়া পাখি
শুধু তার পাশাপাশি দেখেছে কে গৃহহীন জটা
সন্ন্যাসী হয়েছে হাওয়া দু'হাত জেনেছে গৈরিকতা।

আয়ু

এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো
শব্দহীন হও
শষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর

লেখো আয়ু লেখো আয়ু

ভেঙে পড়ে ঝাউ, বালির উত্থান, ওড়ে ঝড়
তোমার চোখের নিচে আমার চোখের চরাচর
ওঠে জেগে

স্রোতের ভিতরে ঘূর্ণি, ঘূর্ণির ভিতরে স্তব্ধ
আয়ু
লেখো আয়ু লেখো আয়ু
চুপ করো, শব্দহীন হও।

মুখোশমালা

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন
দুঃখী ওঠে জেগে।
চোখের সামনে দুলতে থাকে আকাশ
নিচে শহর দুলতে থাকে, ঘর
তারার মতো মিলিয়ে যেতে থাকে—
মানুষবিহীন রাত্রিবেলার পথ
দীর্ঘরেখায় যেন চোখের জল
জলস্রোতে ভাসে সময়, আর
সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন
দিনের বেলার মুখোশমালা খুলে
সাহস করে সত্যি কথা বল্।

হওয়া

হলে হলো, না হলে নেই।
এইভাবেই
জীবনটাকে রেখো।
তাছাড়া, কিছু শেখো
পথেবসানো ওই
উলঙ্গিনী ভিখারিনীর
দু'চোখে ধীর
প্রতিবাদের কাছে।

আছে, এসবও আছে।

বাজি

সন্ন্যাসী হয়েছ সবটুকু ?
সবটুকু।
ছেড়ে দিতে পারো সব ?   রাজি ?
রাজি।
উপেক্ষা কি উপেক্ষা দিয়েই
সহজে ফেরাতে পারো খুলে ?
খুলে
দিয়েছ সমস্ত দ্বার ? আর
নিহিত শীতের রাত্রে তালবীথি দেখেছে আগুন
ওই স্বচ্ছ জলে ?
তবে এসো, এইবার, সবটুকু ধরো, দাও টান
মনে রেখো কিছুতেই কোথাও তোমার কোনো ত্রাণ
নেই
জিতে গেছে বাজি।

কয়েকটি টুকরো

কবিতা

কী কবিতা আর কী কবিতা নয়
এটা বলতে বলতে
ওরা আমাকে মাঠের শেষ কিনারে নিয়ে এল

যেখান থেকে ছুটো ঘোড়া
দুই দিগন্তের দিকে রুখে যায় উদ্দাম ব্যথাময়
সেই ছুটে যাওয়ার ছন্দও, ওরা বলল, কবিতা নয়।

মাতাল

নীরবতার মধ্যে জ্বলে উঠছে আগুন
সমুদ্রের মধ্যে ঝরে পড়ছে ধ্বনি
শরীরের মধ্যে জেগে উঠছে পাতাল

আর-কেউ তা দেখতে পায়নি ব'লে
সবাই ওকে নাম দিয়েছে মাতাল।

সময়

এখন বাঁশি বাজানো যাবে
কেননা বুকের ভিতর অনেকটা ফাঁপা লাগছে
আর বাইরের হাওয়াও বেশ মজবুত।

বই

এখন আমার সব বই ঘুমন্ত, তার মাঝখানে
চুপ করে বসে আছি
ওদের ঘুমোবার আভা আমার গায়ে এসে লাগে।

দরজা বন্ধ করা থাক। এদের নিঃশব্দ শান্তি
আমাকে মুছে নিক
মাথা থেকে নেমে যাক গতদিনের ভার।

আরো কিছু স্তব্ধতার পর
কারো মুখে হাত রেখে বলে উঠি : ওঠো
জেগে ওঠো, এইবার, একা

আর তারপর
এইসব নিরিবিলি দেখাশোনা, তোমার আনন্দে
আমার আনন্দ জেগে-ওঠা।

কুয়াশা

লাফ-দিয়ে চলেছে বাস মেঘের মজ্জার মধ্য দিয়ে
সফেন পালকগুলি খোলাখুলি বুকে এসে লাগে
পাশাপাশি মানুষেরা আজ খুব চুপ হয়ে আছে
'হেডলাইট জ্বালাও' আর অতর্কিতে খোলে দুই চাঁদ
আগায় কিছু-বা ঝাউ ধাবমান শূন্যের ধারায়
চোখের বাঁ-ধার দিয়ে সরে যায় ধবল সবুজ
লাফ-দিয়ে চলেছে বাস ভিতরে ঢুকেছে হালকা ভোর
অবুঝ মেয়েটি সেও অনায়াস করে দিয়ে হাত
চেয়ে দেখে মানুষ কী মুহূর্তে সুন্দর হতে পারে।

ধর্ম

শুয়ে আছি শ্মশানে। ওদের বলো
চিতা সাজাবার সময়ে
এত বেশি হল্লা ভালো নয়।

মাথার উপর পায়ের নিচে হাতের পাশে ওরা
সবাই তোমার বান্দা
ওদের বলো

বলো যে এই শূন্য আমার বুকের উপর দাঁড়াক
খুলুক তার গুল্ফ-ছোঁয়া চুল
মুকুটভরা জলে উঠুক তারা। ওরা পালাক

আর, নাম-না-জানা মুণ্ডমালা থেকে
ঝরে পড়ুক, ধর্ম ঝরে পড়ুক
ঠাণ্ডা মুখে, আমার ঠাণ্ডা বুকে, ঠাণ্ডা!

সঙ্গিনী

হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়
এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।

পায়ের ভিতর মাতাল, আমার পায়ের নিচে
মাতাল, এই মদের কাছে সবাই ঋণী—
ঝল্‌মলে ঘোর দুপুরবেলাও সঙ্গে থাকে
হাঁ-করা ওই গঙ্গাতীরের চণ্ডালিনী।

সেই সনাতন ভরসাহীনা অশ্রুহীনা
তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না ?
তুমি আমায় সুখ দেবে তা সহজ নয়
তুমি আমায় দুঃখ দেবে সহজ নয়।

মানে

কোনো-যে মানে নেই, এটাই মানে।
বন্য শূকরী কি নিজেকে জানে ?
বাঁচার চেয়ে বেশি বাঁচে না প্রাণে।

শকুন, এসেছিস কী-সন্ধানে ?
এই নে বুক মুখ, হাত নে পা নে—
ভাবিস পাবি তবু আমার মানে ?

অন্ধ চোখ থেকে বধির কানে
ছোটে যে বিদ্যুৎ, সেটাই মানে।
থাকার চেয়ে বেশি থাকে না প্রাণে।

ছুটেছে উন্মাদ, এখনো ত্রাণে
রেখেছে নির্ভর, সহজযানে
ভাবে সে পেয়ে যাবে জীবনে মানে !

বিভোর মাথা কেউ খুঁড়েছে শানে
কিছু-বা ভীরু হাত আফিম আনে—
জানে না বাঁচে কোন্ বীজাণুপানে :

কোনো-যে মানে নেই সেটাই মানে।

কোনো-যে মানে নেই সেটাই মানে।

বাবরের প্রার্থনা

রূপ-রূপা-রূপম্‌কে, জন্মদিনে

......

ধ্বংস করো ধ্বজা

আমি বলতে চাই, নিপাত যাও
এখনই
বলতে চাই, চুপ

তবু
বলতে পারি না। আর তাই
নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি দিনের পর দিন।

বলতে চাই, জানি
জানি যে আমার মজ্জার মধ্য দিয়ে তোমার
ঘিরে ঘিরে পাক দেওয়া টান

বলতে চাই তোমার শেষ নেই, কেবল জল, লবণ
তোমার চোখ নেই স্নায়ু নেই
শুধু কুসুম

শুধু পরাগ, আবর্তন, শুধু ঘূর্ণি
শুধু গহ্বর
বলতে চাই, নিপাত যাও—ধ্বংস হও—ভাঙো

কিন্তু বলতে পারি না, কেননা তার আগেই
তুমি নিজে
নিজের হাতে ধ্বংস করো আমার ধ্বজা, আমার আত্মা।

পুরোনো গাছের গুঁড়ি

ছিল-বা হাসির চপলতা। পানপাতা যেন
মুছে নেয় গাল

এমনই সবুজ আভা মুখে
মনে হয়েছিল এত অনাদরে তবুও সজল

স্নেহশাখা, পাতায় পাতায় ক্রীড়াময়, কথা বলা
শিরায় শিরায়

দুধারে ছড়ানো এই প্রণতি ও উত্থান, মনে হয়েছিল
তুমি আছো, আছো তুমি। তবু

চোখ যদি ফিরে আসে মূলে
খুলে যায় রজনীর নীল -

নিচু হয়ে বলি :
পুরোনো গাছের গুঁড়ি, বাকলে ধরেছে কত ঘুণ ?

সেদিন অনন্ত মধ্যরাত

বৃষ্টি হয়েছিল পথে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে
বাসা ভেঙে গিয়েছিল, গাছগুলি পেয়েছিল হাওয়া
সুপুরিডানার শীর্ষে রুপোলি জলের প্রভা ছিল

আর ছিল অন্ধকারে—হৃদয়রহিত অন্ধকারে
মাটিতে শোয়ানো নৌকো, বৃষ্টি জমে ছিল তার বুকে
ভেজা বাকলের শ্বাস শূন্যের ভিতরে স্তব্ধ ছিল

মাটি ও আকাশ শুধু সেতু হয়ে বেঁধেছিল ধারা
জীবনমৃত্যুর ঠিক মাঝখানে বায়বীয় জাল
কাঁপিয়ে নামিয়েছিল অতীত, অভাব, অবসাদ

পাথরপ্রতিমা তাই পাথরে রেখেছে শাদা মুখ
আর তার চারধারে ঝরে পড়ে বৃষ্টি অবিরল
বৃষ্টি নয়, বিন্দুগুলি শেফালি টগর গন্ধরাজ

মুছে নিতে চায় তার জীবনের শেষ অপমান
বাসাহীন শরীরের উড়ে-যাওয়া ম্লান ইশারাতে
বৃষ্টি হয়েছিল বুকে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে।

ডানা এখন চুপ

চোখের পাতায় মেঘের ছবি ছিল পাহাড়ের দিকে উড়ে যাবে ব'লে
ডানা এখন চুপ।

এখন আর অন্ধকার নেই
ভোর হলে শিশিরে-শিউলিতে নরম হয়ে আসে দিগন্ত

ঠিক তখনই তার সাহস হলো মুছে যাবার।

মাটির দিকে নামিয়ে নিই আমাদের মুখ
পাহাড়ের গা থেকে
খসে পড়ে দু'একটি নিরিবিলি শিলা

ফিরে আসার সময়ে কেবল শোনা যায় পায়ের শব্দ—
কোনো একজন নেই
সেকথা কারো-বা মনে পড়ে অল্প-অল্প।

পথের বাঁকে

আজ আমার কথা বলবার কথা নয়
তবু বলি :
দাঁড়িয়ে আছি এই পথের বাঁকে

আর সামনেই
ডালপালাছাড়া দীর্ঘ বাকল
ঠাণ্ডা আর চুপ

ত্রিবলী ভাঁজের মধ্যে কেবল
লুকিয়ে রাখা
দশকের পর দশকের সব সমর্পণ

আর হয়তো
দু'একটি আশ্রয় দেবারও স্মৃতি
কুঠারের ওঠানামা

তারপর
গঙ্গার দিকে মিলিয়ে যাওয়া কত পায়ের
রেখা আর ধ্বনি

আমাকে রেখে যায় এইখানে
অশীতিপর, অন্ধ, আর
সন্ততিহীন !

শাদা ফলক

সেদিন রাত্রে ফিরে আসার মুহূর্তে
শহরের বুকের মধ্যে
কুয়াশা ভেঙে জেগে উঠছিল রাশি রাশি নাম না-জানা কবর

প্রথমে মনে হয়েছিল যেন
স্থির হয়ে বসে আছে সারি সারি নতজানু নান
প্রার্থনায় হিম

হাওয়া ছিল মাঘের
কেঁপে উঠছিল চরাচর ইউক্যালিপটাসের গন্ধের দিকে
অপরাধময়

তারপর
কুয়াশা হলো পাথর
প্রার্থনাও হলো ওই শাদা ফলকের অভিমান

মসৃণ, এপিটাফহীন
ফিরে আসার সময়।

মণিকর্ণিকা

চতুর্দশীর অন্ধকারে বয়ে যায় গঙ্গা
তার ওপরে আমাদের পলকা নৌকোর নিশ্বাস
মুখে এসে লাগে মণিকর্ণিকার আভা

আমরা কেউ কারো মুখের দিকে তাকাই না
হাতে শুধু ছুঁয়ে থাকি পাটাতন
আর দু'এক ফোঁটা জলের তিলক লাগে কপালে

দিনের বেলা যাকে দেখেছিলে চণ্ডাল
আর রাত্রিবেলা এই আমাদের মাঝি
কোনো ভেদ নেই এদের চোখের তারায়

জলের ওপর উড়ে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ
বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে ভস্ম
পাঁজরের মধ্যে ডুব দিচ্ছে শুশুক

এবার আমরা ঘুরিয়ে নেব নৌকো
দক্ষিণে ওই হরিশ্চন্দ্রের ঘাট
দুদিকেই দেখা যায় কালু ডোমের ঘর

চতুর্দশীর অন্ধকারে বয়ে যায় গঙ্গা
এক শ্মশান থেকে আরেক শ্মশানের মাঝখানে
আমরা কেউ কারো মুখের দিকে তাকাই না।

জীবনবন্দী

করুণা চেয়েছি ভাবো? তোমাদের সমর্থন? ভুল।
অনুমোদনের জন্ত হৃদয়ে অপেক্ষা নেই আর।
সে জানে ভুলের মাত্রা, সে জানে ধ্বংসের সব সূচি,
এ হাতে ছুঁলে সে জানে ভস্ম হয়ে যাবে ওই মুখ।
কার কাছে কথা তবে? কারো কাছে নয়। এ কেবল

যেভাবে জীবনবন্দী বুকচাপা কুঠুরিতে ব'সে
দিনের রাতের চিহ্ন এঁকে রাখে দেয়ালের গায়ে
সেইমতো দিন গোনা রাত জাগা মাথা খুঁড়ে যাওয়া,
লোহাতে লোহার ধ্বনি জাগানো, বাজানো, বিফলতা।
যে দেখে সে দেখে শুধু একজন খুলে দিয়ে চুল
সবারই পাঁজর চেপে দাঁড়িয়েছে লোল রসনায়
এ কেবল তারই নাচ বলয়ে বলয়ে বুনে যাওয়া—
ভালো যদি বলো একে ভালো তবে, না বলো তো নয়।

তক্ষক

তোমার কোনো বন্ধু নেই তোমার কোনো বৃত্তি নেই
কেবল বন্ধন
তোমার কোনো ভিত্তি নেই তোমার কোনো শীর্ষ নেই
কেবল তক্ষক
তোমার কোনো নৌকো নেই তোমার কোনো বৈঠা নেই
কেবল ব্যাপ্তি
তোমার কোনো উৎস নেই তোমার কোনো ক্ষান্তি নেই
কেবল ছন্দ

তোমার শুধু জাগরণ শুধু উত্থাপন কেবল উদ্ভিদ
তোমার শুধু পান্না আর শুধু বিচ্ছুরণ কেবল শক্তি

তোমার কোনো মিথ্যা নেই তোমার কোনো সত্য নেই
কেবল দংশন
তোমার কোনো ভিত্তি নেই তোমার কোনো শীর্ষ নেই
কেবল তক্ষক

তোমার কোনো বন্ধু নেই তোমার কোনো বৃত্তি নেই
কেবল বন্ধন
তোমার কোনো দৃষ্টি নেই তোমার কোনো শ্রুতি নেই
কেবল সত্তা।

মহানিমগাছ

ঈশানে নৈঋতে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে
মাটির উপর মুখ রেখে
সে এখন শুয়ে আছে শেষ রাতের খোলা প্রান্তরে

আর কেউ নেই
শুধু তার পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ তারা

হাতের ডানায় লেগে আছে ঘাসের সবুজ, বুকে ভেজা মাটি
এইটুকু ছাড়া
যেন কোনো কোমলতা ছিল না কোথাও কোনোখানে

তারপর
আকাশ আর পৃথিবীর ঢাকনা খুলে বেরিয়ে আসে ভোর
এসে দেখে :

যেখানে সে পা দুখানি রেখেছে, সেখানে
কাল বিকেলের শেষ ঝড়ে
পড়ে আছে ক্ষুরে-খাওয়া সনাতন মহানিমগাছ।

এইসব কথা বলাবলি

এইসব কথা বলাবলি
চোখ দিয়ে চোখ দেখা আর
স্ফটিকের মতো প্রতিভার
এইসব ঠিকরোনো আলো
এরই মাঝখানে এক ঘুম
বয়ে যায় জানাশোনাহীন
ঘুমের সেতুর পরপারে
ছায়াময় হিম ও শিশির
কুয়াশার পালকের টানে
মুছে নিয়ে চলে যায় দূরে
সেইখানে বসে কেউ শোনে
এইসব কথা বলাবলি—
তুমি তাকে দেখেছ, কখনো
বোঝোনি কতটা তার মানে।

একদিন সিঁড়ি বেয়ে

একদিন
সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে কেউ
নিজেরই শরীরভরা পাতালের দিকে

এসে দেখে
বড়ো বেশি ভুল হয়ে গেছে

এখানে দিগন্ত নেই দিকও নেই কোনো
জল নেই আছে শুধু জলীয় গুল্মের
সমারোহ

এখানে আগুন নেই দাহ নেই, ততখানি হিমও নেই
যতখানি হলে
মনে হতে পারে

পৃথিবী বরফ হয়ে আছে

সব নেই ম্লান করে শুধু আছে একজন, আর
মুখোমুখি
অধিকারহীন সেও আছে

এতদিন
পাতালের কাছে।

কেউ কারো মতো নয়

কেউ কারো মতো নয়, সমস্ত নিঃশব্দ নিজে-আলো

যা ছিল তা নেই আর, যা হবে তা হবার মতো না
যা আছে তা ধরে আছে গহনে ফলসারঙা মেঘ

যাও চলে যাও, যাও যতদূরে যেতে পারো যাও
সুপুরিবনের সারি যেদিকে চলেছে অবেলায়

কেউ কারো মতো নয়, নিজে নিজে বসেছ সকলে
এভাবে থাকার মানে আমারই নিঃশব্দে ফিরে আসা
তাই আমি ফিরে আসি, যতদূর চোখ যায়, দেখি
যা আছে তা ধরে আছে ঝড় নয়, কিছু কবুতর।

একদিন আমরাও

একদিন আমরাও এসে বসব
এইসব পার্কে
একদিন আমরাও বলব, বয়স কত হলো? দিনকাল কেমন?

পিছনে পড়ে থাকবে কম্পাস
কিংবা কবুতরের ডানা
একদিন আমরাও বলব, ভুল বাপু, ভুল

হাতের তালুতে তুলে নেব আমলকী একদিন আমরাও
আর এ ওকে বলব হাওয়ায় হাওয়ায়:
দেখো, এই হলো আমাদের পৃথিবী।

বাবরের প্রার্থনা

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয় !
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা !

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান ;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক ।

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের ?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে ?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝল্‌সানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের ?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে ?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক ।

শূন্যের ভিতরে ঢেউ

বলিনি কখনো ?
আমি তো ভেবেছি বলা হয়ে গেছে কবে।

এভাবে নিথর এসে দাঁড়ানো তোমার সামনে
সেই এক বলা

কেননা নীরব এই শরীরের চেয়ে আরো বড়ো
কোনো ভাষা নেই

কেননা শরীর তার দেহহীন উত্থানে জেগে
যতদূর মুছে নিতে জানে

দীর্ঘ চরাচর,
তার চেয়ে আর কোনো দীর্ঘতর যবনিকা নেই

কেননা পড়ন্ত ফুল, চিতার রুপালি ছাই, ধাবমান শেষ ট্রাম
সকলেই চেয়েছে আশ্রয়

সেকথা বলিনি ?   তবে কী ভাবে তাকাল এতদিন
জলের কিনারে নিচু জবা ?

শূন্যতাই জানো শুধু ?   শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে
সেকথা জানো না ?

মোরগঝুঁটি

গিয়েছে আর সব, কেবল বাকি
বুকের ভিতরের মোরগঝুঁটি।

সেখানে হাওয়া দেয় অপরিণাম
শূন্যতায় ঘেরা তোমার নাম।

হাওয়ার টান হলো আদিম ঝড়
পাথরও ফেটে যায়, ওড়ে পাথর।

তখনও কাঁপে তার পাঁজরতলে
আগুনে পোড়ে না যা, ভেজে না জলে।

খড়

পাথরের উপর খড় বিছানোর শব্দ
বুকে তোমার হাত

পাথরের উপর খড় বিছানোর শব্দ
বুকে তোমার হাত

তরাই থেকে উঠে আসে রাত্রি
শিখর থেকে গড়িয়ে আসে নিশ্বাস
মস্ত এক চাকার নীল ঘূর্ণি

বুকে তোমার হাত
পাথরে ওই খড়ের হেম নিশ্চল।

দাগ

এখন আমার বুক বেঁধে দিয়েছ শহরের অ্যাসফল্টে
তার ওপর ঘাস ওঠে না কোনো
শুষে নেয় না কোনো বৃষ্টির জল আমার অন্তরাত্মা

শুধু পদপাত শুধু পদপাত আর অন্তঃসারহীন
পাঁজরকাঁপানো আলোয়
ভারি আর মজবুত টায়ারের বেগময় উল্লাস

তবু, কখনো কখনো জামা খুলে দেখাই
এইখানে, দেখো
লেগে আছে আজও সেই দাগ।

মিলন

বলেছিলাম, এসো, নতুন হও আবার
খুলে ফেলো সব সাজ
রাখো কেবল শরীর

আর অমনি তুমি ঘুরে দাঁড়াও
চোখ পড়ে স্ফুরিত দুই চোখে
মুখে উঠে আসে হালকা ছায়া

লাগামে টান লাগবার আগের মুহূর্তে
ঠিক যেভাবে
নিঃশ্বাস নেয় পুরোনো ঘোড়া।

এইরকমই

ভুল কোরো না। মুখের দিকে তাকাও। অনেক পাবে।
চলে যাবে যাও, কিন্তু কী অভিযোগ বলো।
পাহাড়ও নয়, অরণ্য না, শহরগলির সিঁড়ি
বুকের মধ্যে ঘুরে যাবার শ্যাওলাজমা ইট
চুল কাঁপে না, চোখের পাতা, কী গ্রীষ্ম কী শীত
অন্ত্রে নেমে যাবার ভয়, উপশিরার ছোবল
সমস্ত ঠিক, জীবনযাপন এইরকমই, ধূপ
কোথায় যাবে, পাহাড়ও নয়, অরণ্য না, সব
এইরকমই, ভুল কোরো না, সমস্ত দিক ধাও
মুখের দিকে তাকাও আর সিঁড়ির নিচে জলো।

দু' একটি ছবি

ছিপ

ছুটেছে ট্রাফিক, জল, শিবিরে শিবিরে ঢেউ, ফেনা
যে যায় সে কোথাও তো যায়!
শুধু একজন
ছিপ নিয়ে সারাবেলা বসে আছে দীন সারাবেলা
প্রতিবিম্ব ছাড়া কিছু নেই!

অঙ্গার

আসলে শান্ত খুব, চুপ
গৃহী ব'লে মেনে নিই মনে।
হঠাৎ খুলেছে সব জামা
বুকে সূর্যাস্তের হামা
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে নীল।

তারপরে নীরব নিখিল
পড়ে থাকে ক্ষীণ অন্ধকার

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড

মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমিও কি
তুমি কি পাগল হয়ে যাবে ?

কিন্তু তা সহজ নয়, কেননা এখনও
এই ঘোলাটে জলদ সর্বনাশ

এই সকলের লাঞ্ছিত কলকাতা
শ্রাবণের হঠাৎ বর্ষণে

সমস্ত মোচন করে খুলে দেয় অতর্কিতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড
আর তার ঝাপসা শূন্যতায়

হালকা পায়ে ভিজে যায় ওই দুটি মানব-মানবী
শিরস্ত্রাণহীন।

শুশ্রূষা

এখন তুমি ভালো, কেননা এখন কোনো কথা বলোনি।

যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে, শরীরে লাগল ঢেউ :

এই শুধু, আর কোনো কথা নেই

চোখের শুশ্রূষা হলো, এই শুধু।

মিলের জন্য ব্যক্তিগত

ওই হাতে হাত মুক্তি পেলে জেগে ওঠেন ব্যক্তিগত
তখন আমি সবার মুখের উৎস দেখি তোমার মতো।
শিরায় শিরায় মহীরুহ ছড়িয়ে দেয় আপন ব্যূহ
প্রগল্ভতার উজ্জ্বলতা তখনই হয় লজ্জানত
আনন্দে চোখ কাঁপতে থাকে, বুকের নিচে পূর্ণ ক্ষত।

এখন লেগেছে গায়ে বড়ো বেশি ব্যক্তিগত হাওয়া
এখন উড়েছে সব ধুলো
আকাশের দিকে আর পথেরও ধমনী দেয় সাড়া
ভুলে যেও সব কিছু ভুলো
এখন সমস্ত চোখে লুকোনো দেখেছি দূর ফেরি
হয়তো-বা এও খুব দেরি
এখন শহর থেকে শহরের স্মৃতিমুখে যাওয়া
এখন লেগেছে গায়ে বড়ো বেশি ব্যক্তিগত হাওয়া

ঢাকা ১৯৭৫

সমস্ত ধুলোর মধ্যে মিশে থাক স্তব
তোমার পায়ের মুদ্রা থেমে থেমে যাবে

প্রতিটি সকাল হোক ভ্রমণের স্মৃতি
চোখের প্রথম মুক্তি নদীতে তাকাবে

কৃষ্ণচূড়া এ শহর করে দিক রাধা
তখনই সবার বুকে দামামা বাজাবে

ছিন্ন মুহূর্তের সেই ভস্ম হওয়া জ্বালা—
সেদিন আমার ছিলে, আজ কার পালা ?

দুই মুহূর্ত

হাত তোলো যদি নৃত্যনাট্য
কথা যদি বলো ছন্দ
ভ্রূকুটিশাসনে অবশ করেছ
শরীরের চতুরঙ্গ।

স্তব্ধ বসেছি আকাশের নিচে
শূন্যতা ওঠে গ'ড়ে
খান্ খান্ করে দিয়েছিলে সব
অনায়াসে এরই জোরে।

শরীরে হঠাৎ ফেরে কৈশোর
মাটিতে ছোঁয়ালে পা
আর কোনোদিন তোমার ঘরের
ত্রিসীমায় যাব না।
লতায় লতায় জড়িয়ে উঠেছে
অবাধ সবুজ স্মৃতি
শিরার ভিতরে নৌকোনদীর
সংঘাত আজও ঠিকই!

বেজে উঠল ঢাক

খুব দূর থেকে গড়িয়ে আসে ঢাকের শব্দ
এখন রাতদুপুর

সপ্তর্ষির দিকে উড়ে যায় শহরের ঘর
চোখের পাতায় বইতে থাকে খাল, খালের পাশে শ্যাওলাজমা মঠ

নেমে আসার জমি
যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা তালসুপুরি

জলের উপর ভাসে আমার ছেড়ে আসা
সারিবাঁধা বদর বদর ডাক

বেজে উঠল অনেকদিনের ঢাক।

তখনও রাতদুপুর
সবার চোখে উপুড়করা প্রদীপ

জাগে কেবল
পাটাতনের পাঁজরভাঙা চলন্ত মাস্তুল

ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে রাখে কেবল দূরের
মাটি, আমার বিলীয়মান মাটি—

বেজে উঠল হাজার কাঠির ঢাক।

মনকে বলো 'না'

এবার তবে খুলে দেওয়া, সব বাঁধনই আলগা করে নেওয়া।
যখন বলি, কেমন আছো? ভালো?
'ভালো' বলেই মুখ ফিরিয়ে নেবার মতন মরুভূমি
এবার তবে ছিন্ন করে যাওয়া।

বন্ধ ছিল সদর, তোমার চোখ ছিল যে পাথর
সেসব কথা আজ ভাবি না আর
যাওয়ার পরে যাওয়া কেবল যাওয়া এবং যাওয়ায়
আকাশ গন্ধরাজ।

শিরায় শিরায় অভিমানের ঝর্না ভেঙে নামে
দুই চোখই চায় গঙ্গাযমুনা
মন কি আজও লালন চায়? মনকে বলো 'না'
মনকে বলো 'না', বলো 'না'।

ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ

ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ

চুরমার কেটে যায় মেঘ, দশভাগে দশটান বিদ্যুৎ
তারপর সব চুপ

এই তোমার মুখ, তিমির
কিন্তু তারপর সব চুপ

পাথর কুলিশ লোহা শাবল হাণ্টার
তারপর সব চুপ

ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ

ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ

কিছু-না থেকে কিছু ছেলে

আমারই বুক থেকে ঝলক
পলাশ ছুটছিল সেদিন

লোকেরও লাগছিল ভালো—
লোকের ভালো লাগছিল।

লোকে কি জেনেছিল সেদিন
এখনও বাকি আছে আর কে ?

আসলে ভেবেছিল সবই
উদাস প্রকৃতির ছবি।

তবু তো দেখো আজও ঝরি
কিছু-না থেকে কিছু ছেলে

তোমারই সেণ্ট্রাল জেলে,
তোমারই কার্জন পার্কে !

হাসপাতালে বলির বাজনা

আমার ভাই ছিল ফেরার, আমার মাসীমা যখন মারা যান।

চারদিকে ছুটছিল বাজি, কালীপুজোর রাত। হাসপাতালের বারান্দাও কেঁপে উঠছিল আনন্দে।

তালে তালে জাগছিল হিক্কা, শেষ সময়ের নিশ্বাস। হয়তো এবার শুনতে পাব : রঞ্জন রঞ্জন

বেজে উঠল ঢাক, হাজার কাঠির ঝনৎকার। আমরা সবাই নিচু হয়ে কান নিয়েছি কাছে

ঠোঁটের ভিতর ফেনিল ঢেউ : এল, ওই এল ওদের নিশান, আমায় ছাড়্। ডুবড়ি ওঠে জ'লে।

আমরা সবাই বলেছিলাম : শেষ সময়ের প্রলাপ।

হাসপাতালে বন্দির বাজনা।   ভাই ছিল ফেরার।

শাস্তি

নিচু গলায় কথা বলার অপরাধে তার
যাবজ্জীবন
কারাদণ্ড হলো।

হামলে পড়ল তার ওপর তিনটে ভালুক
ঠিক ভালুক নয়, প্রহরী
ঠিক প্রহরীও নয়, সত্যি বলতে, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা

মেরুদণ্ড থেকে শাঁস তুলে নিতে নিতে
বলল তারা, খবরদার
এদিক-ওদিক তাকাবে না, কেবল গলা খুলে চেঁচাও।

ভিখিরি ছেলের অভিমান

আগে বলবেন, গা রে খোকা
পরে বলবেন, মাপ করো
সামনে থেকে যা সরে যা
নামার পথটা সাফ করো

গাব না তাই গান

আগে বলবেন, গতর খাটো
পরে মারবেন লাথি
আগে কথার ধুল্ ওড়াবেন
পরে দাঁতকপাটি

গাব না আর গান

বেশ করেছি ভেক ধরেছি
বাঁচিয়ে রাখি জান
দূরের থেকে দেখি সবার
দরদভরা টান

গাব না আর গান এবার
গাব না আর গান।

কালযমুনা

বেচিস না মা বেচিস না
বেচিস না আমায়
ওরাও ছিঁড়ে খাবে, না হয়
তুই আমাকে খা

দু'একটা দিন বাঁচতে পাবি
আমার রক্ত খেয়ে
বলতে পাবি, নতুন জন্ম
দিয়েছে তোর মেয়ে

নতুন জন্মে নতুন করে
আনিস না আর বোন
চোখের সামনে খেলা করতে
দিস না এতক্ষণ

ওকেও হয়তো বেচতে হবে
বেচিস না আমায়
সবাই মিলে খাবে, বরং
নিজেই আমায় খা।

পাখি বিষয়ে দুটি

শোক

না জেনে এ কোন জালে ফেললেন প্রভুজীবন।
না কি জেনেই ?
এতদিন বেশ টেনেটুনে এসে
আজ এই ঘোর রজনীর শেষে
ঘরে ফিরে দেখি খাঁচা পড়ে আছে
পাখি যে নেই।

উপকরণ

বন থেকে বেরুলেন টিয়ে
ইতিউতি তাকালেন
তারপর উঠলেন গিয়ে
বাবুদের মোটরে।
এবার শিল্প হোক, এবার শিল্প হোক
বাবুরা যাভেন বনে
কোটরে।

চাপ সৃষ্টি করুন

ঝরে যাবেন ? ঝরুন
ঝরুন দাদা, ঝরুন !
ভিতরদিকে আছেন যারা
একটু মশাই নড়ুন—
চাপ সৃষ্টি করুন !
চাপ সৃষ্টি করুন !

হঠাৎ ঝাঁপে উলটে যাবেন
শক্ত হাতে ধরুন
খুব যে খুশি পা-দানিতেই
কেইবা চায় দুঃখ নিতে—
যা পেয়েছেন দেখুন ভেবে
নাক না ওটা, নরুন।

একটু মশাই নড়ুন
ভিতর থেকে নড়ুন
চাপ সৃষ্টি করুন
চাপ সৃষ্টি করুন।

'মার্চিং সং'

সুন্দরী লো সুন্দরী
কোন্ মুখে তোর গুণ ধরি
দিব্যি সোনার মুখ করে তুই
দুই বেলা যা খাস
ঘাস বিচালি ঘাস।

ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস
কিন্তু মুখে জ্বলবে আলো
পদ্মাভসংকাশ
নেই কোনো সন্ত্রাস !

নেই কোনো সন্ত্রাস
ত্রাস যদি কেউ বলিস তাদের
ঘটবে সর্বনাশ—
ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস !

রাধাচূড়া

মালী বলেছিল। সেইমতো
টবে লাগিয়েছি রাধাচূড়া।
এতটুকু টবে এতটা গাছ ?
সে কি হতে পারে ? মালী বলে
হতে পারে যদি ঠিক জানো
কী ভাবে বানায় গাছপালা।

খুব যদি বাড়্ বেড়ে ওঠে
দাও ছেঁটে দাও সব মাথা
কিছুতে কোরো না সীমাছাড়া
থেকে যাবে ঠিক ঠাণ্ডা চুপ—
ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে
লোকেও বলবে রাধাচূড়া।

সবই বলেছিল ঠিক, শুধু
মালী যা বলেনি সেটা হলো
সেই বাড়, নিচে চারিয়ে যায়
শিকড়ে শিকড়ে মাথা খোঁড়ে, আর
এখানে-ওখানে মাটি ফুঁড়ে
হয়ে ওঠে এক অন্য গাছ।

এমন-কী সেই মরুভূমি টব
ইতস্ততের চোরা টানে
বড়ো মাথা ছেড়ে ছোটো মাথায়
কাতারে কাতারে ঝেঁপে আসার
ফেটে যেতে পারে হঠাৎ যে
সে কথা কি মালী বলেছিল ?

মালী তা বলেনি, রাধাচূড়া !

মহাজন

কথা বলেই বা কী হচ্ছিল
না-ই বললেন কথা—
চুপচাপ থেকে দেখুন না আজ
কদ্দূর যায় রথ।

ভিতরে ভিতরে ঘটছিল কত
জানতেন কিছু তার ?
কে না জানে ওতে হতেও পারত
ঘোরতর সংকট।

বিপদকালে যে অর্ধেক রেখে
অর্ধেক দেয় ছেড়ে
শাস্ত্রে তাকেই বলেছে প্রাজ্ঞ
কর্মঠ আর সৎ।

এই জেনে প্রভু যা বলেন তাই
করে যান শিরোধার্য
হাতের মুঠোয় মিলে যাবে সব
সমুদ্র-পর্বত।

তারপরে কোনো শুভ দিন এলে
সময়লগ্ন বুঝে
ছড়িয়ে দেবেন স্ফুলিঙ্গ কিছু
কিছু ওঁ তৎসৎ।

'আপাতত শান্তিকল্যাণ'

পেটের কাছে উঁচিয়ে আছো ছুরি
কাজেই এখন স্বাধীনমতো ঘুরি
এখন সবই শান্ত, সবই ভালো।
তরল আগুন ভরে পাকস্থলী
যে-কথাটাই বলাতে চাও বলি
সত্য এবার হয়েছে জমকালো।

গলায় যদি ঝুলিয়ে দাও পাথর
হালকা হাওয়ার গন্ধ সে তো আতর
তাই নিয়ে যাই অবাধ জলস্রোতে—
সবাই বলে, হা হা রে রঙ্গিলা

জলের উপর ভাসে কেমন শিলা
শূন্যে দেখো নৌকো ভেসে ওঠে।

এখন সবই শান্ত সবই ভালো
সত্য এবার হয়েছে জমকালো
বক্ষ থেকে পাঁজর গেছে খুলে
এ-দুই চোখে দেখতে দিন বা না দিন
আমরা সবাই ব্যক্তি এবং স্বাধীন
আকাশ থেকে ঝোলা গাছের মূলে।

শৃঙ্খলা

শব্দ কোরো না
হেসো না বাচ্চা
চুপ
হাত-পা ছুঁড়ো না
দাঁত খুলে রাখো —
বাঃ
এবার শান্তি
স্বস্তি এবার
উঃ!

সিঁড়ি থেকে সরো
সিঁড়ি থেকে নামো
ধুপ-
রির মাঝখানে
মাথা গুঁজে ব'সে
পড়ো।

পাখা গজিয়েছে ?
উড়বে ভেবেছ ?
আঃ
এই যে হাজার
কিংকর কিং-
করী
ডানা ছেঁটে দিলে
হবে ডানাকাটা
পরী ।

তাই বলি আর
শব্দ কোরো না
চুপ
হাত-পা জমিয়ে
রাখো ঠাণ্ডায়
ওঁ ।

বাবু বলেন

আমি কেবল কথাই বলি
পুঁথিই পড়ি বসে
জীবনযাপন ? করুক সেটা
চাকরবাকরেরা ।
মরছে যারা মরুক তারা
নিজের নিজের দোষে
আমি জানি, মাথার জোরে
আমিই সবার সেরা ।

মানুষ ছুঁতে চাই না বটে,
মানবতার জ্ঞানে
হৃদয়মেধা থাকে আমার
সব সময়ে ঘেরা
পাল্টে দিতে পারি ভুবন
আখ্যানে-ব্যাখ্যানে—
জীবনযাপন ? করবে সেটা
চাকরবাকরেরা।

সবাই যদি বলেও আমায়
মিথ্যে এবং মেকি
নিজের কথার জ্বালায় যদি
জ্বলে নিজের ডেরা
পুড়তে পুড়তে তখনও তার
জানলা দিয়ে দেখি
জীবনযাপন করছে যত
চাকরবাকরেরা।

বিকল্প

নিশান বদল হলো হঠাৎ সকালে
ধ্বনি শুধু থেকে গেল, থেকে গেল বাণী
আমি যা ছিলাম তাই থেকে গেছি আজও
একই মতো থেকে যায় গ্রাম রাজধানী

কোনো মাথা নামে আর কোনো মাথা ওঠে
কথা ছুঁড়ে দিয়ে যায় সারসের ঠোঁটে।

আমার গাঁয়েই না কি এসেছিল রাজা
কখনও দেখিনি এত শালু বা আতর
নিচু হয়ে আঁজলায় চেয়েছি বাতাস
রাজা হেসে বলে যায় : ভালো হোক তোর।

কথ তবু থেকে যায় কথার মনেই
কঠোর বিকল্পের পরিশ্রম নেই !

হাতেমতাই

হাতের কাছে ছিল হাতেমতাই
চুড়োয় বসিয়েছি তাকে
দুহাত জোড করে বলেছি 'প্রভু
দিয়েছি খত দেখো নাকে।
এবার যদি চাও গলাও দেব
দেখি না বরাতে যা থাকে—
আমার বাঁচামরা তোমারই হাতে
স্মরণে রেখো বান্দাকে !'

ডুমুরপাতা আজও কোমরে ঝোলে
লজ্জা বাকি আছে কিছু
এটাই লজ্জার। এখনও মজ্জার
ভিতরে এত আগুপিছু !
এবার সব খুলে চরণমূলে
ঝাঁপাব ডাঁই-করা পাঁকে
এবং মিলে যাব যেমন সহজেই
চৈত্র মেশে বৈশাখে।

মনোহরপুকুর

শহর তার বুকের থেকে খুলে দিয়েছে ঢাল
অরক্ষিত যে-কোনো দিকে ছুটেছে মানুষেরা
এক নিমেষে মিশে গিয়েছে তরঙ্গ ও ত্রাস

গলির মুখে খুলে গিয়েছে সুড়ঙ্গের ডালা
হাজার হাত ছড়িয়ে আছে অকালভৈরবী
এ চোখে যদি অসুর তার অন্য চোখে সুরা

অগস্ত্যের চুমুক শুষে নিয়েছে সব জল
পাতাল ছিঁড়ে জেগেছে যত মাছের মৃতদেহ
মাথার থেকে মাথায় ছোটে বিদ্যুতের শিরা

দিনদুপুরে নিলামডাকে বিকিয়ে গেছে পাড়া
আমিও শুধু একলা বসে মনোহরপুকুরে
ছিপ করেছি নিজের হাতে নিজেরই শিরদাঁড়া !

নচিকেতা

দিয়ে যেতে হবে আজ এই দুই চোখ
ঘ্রাণ শ্রুতি স্পর্শ সব দিয়ে যেতে হবে।
উঠোনে দোপাটি হাওয়া স্মৃতি ও ডালিম
মাঠের পথিক শ্রান্তি দিগন্তদুপুর
কিছু উজ্জীবন কিছু হাহাকার আর
দিয়ে যেতে হবে সব সেতুহীন দিন।
গাভীর শরীরে দ্যুতি অন্ধকারে হীরা
দিয়ে যেতে হবে সব বিচালি ও খড়

নিবন্ত মশাল আর ভিটে মাচা ঘর
যা কিছু করেছি আর করিওনি যত
এবার যজ্ঞের শেষে দিতে হবে সব।
এবার নিভৃত এই অপমানে শোকে
যে-কটি অন্তিম জবা উঠেছিল জলে
আগুনে ঝরিয়ে দিতে হবে। আর তোকে
যমের দক্ষিণ হাতে দিতে হবে আজ
চায় তোকে দৃষ্টিহীন বধির সমাজ!

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ

উৎসর্গ

ভোর এল ভয় নিয়ে, সেই স্বপ্ন ভুলিনি এখনো।

স্থির অমাবস্যা, আমি শিয়রে দাঁড়িয়ে আছি দিগন্তের ধারে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে
আমার শরীর যেন আকাশের মূর্ধা ছুঁয়ে আছে।

বুক থেকে হাতে খুলে নিয়েছি পাঁজর আর তালে তালে নাচে সেই হাত
গ্রহনক্ষত্রের দল ঝমঝম শব্দে বেজে ওঠে।
স্তূপ হয়ে অন্ধকারে সোনারঙা স্বর ওই ওঠে আর উঠে ঝরে পড়ে।

সেই সুরে খুলে যায় নামহারা গহ্বরের মৃতদেহগুলি
পিছনে অলীক হাতে তালি।
অবসন্ন ফিরে দেখি ঘাসের উপরে শুয়ে আছে

পুরোনো বন্ধুর দল
শিশির মাখানো শান্ত প্রসারিত হাতগুলি বাঁকা।

১

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, রক্তে জল ছলছল করে
নৌকোর গলুই ভেঙে উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ
জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর
আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে।

২

ঝড়ে-ভাঙা লাইটপোস্ট একা পড়ে আছে ধানখেতে
শিয়রে জোনাকি, শূন্যে কালপুরুষের তরবারি
যুদ্ধ হয়ে গেছে শেষ, নিঃশব্দ প্রহর দশ দিকে
যেদিকে তাকাও রাত্রি প্রকাণ্ড নিকষ সরোবর।

৩

ঠাণ্ডা পাথরের ঘর, কবুতর অন্ধ খোপে খোপে
থামগুলি উঠে গেছে প্রাঞ্জল শিখরে, শীর্ষে আলো
নীল কাচ ভেদ ক'রে বুকে ছুটে আসে বর্তমান
হাজার হাজার বর্শা ছেঁড়া পালকের গন্ধে ভরা।

৪

চোখের পাতায় এসে হাত রাখে শ্লথ বেলপাতা
পাকা ধান নুয়ে প'ড়ে আদরে ঘিরেছে শরীরী
বালির গভীর তলে ঘন হয়ে বসে আছে জল
এখানে ঘুমোনো এত সনাতন, জেগে ওঠা, তাও।

৫

ভাসন্ত শবের মুখে বসেছিল দক্ষিণের পাখি
সূর্যের অন্তিম হাত মুছে দিয়েছিল দুঃখরেখা
পলিতে পলিতে দেশ ছেয়ে যাক ! যায়নি এখনো ?
ভাসন্ত শবের পাখি সূর্যের কুহরে উড়ে যায় ।

৬

আর্তনাদ করে ওঠে, দুহাত বাড়িয়ে বলে : এসো
এসো সর্বনাশে এসো আগ্নেয় গুহায় এসো বোধে
এসো ঘূর্ণিপাকে বীজে অন্ধের ছোঁয়ায় এসো এসো
শিকড়ে গরল ঢেলে শিখরে জাগিয়ে দেব জ্বালা ।

৭

বৃত্ত আঁকা হয়ে গেছে বৃত্তের ভিতরে জল আঁকা
জলের ভিতরে আমি আমার উপরে ওঠে জল
ছোটো ছোটো ঘাত লেগে বৃত্ত ভেঙে বৃত্ত বেড়ে যায়
আচম্বিত জলস্রোতে সমস্ত বৃত্তের অবসান ।

৮

ঘরবাড়ি ভিজে যায় অশান্ত ধানের মাঝখানে ।
রবিউল ব'সে দেখে । এ রকমই মীড় বা গমকে
ভরে ছিল সময়ের স্বরগুলি একদিন, আজ
বাজনা রয়েছে পড়ে, ফিরে গেছে বাজাবার হাত ।

৯

শরীর ধূপের মতো শান্ত করে রেখেছিল ঘর
দুটো বেড়ালের ছায়া নিবিড় দেয়ালে আড়াআড়ি।
শাদা লোমে ভরে ওঠে ভোরের বাতাস, দেখি চেয়ে
এইখানে ছিল, আজ কয়বিন্দু ভস্ম পড়ে আছে।

১০

আমার ঘরের কাছে রেখেছে তোমার শবদেহ
বাহকেরা দূরে দূরে মুহূর্তের বিশ্রামে আতুর
তার মাঝখান থেকে চুরি করে তুলে নিতে যাই
প্রতি রোমাঞ্চের কাছে আমাদের যৌথ দিনগুলি!

১১

এই সব লেখা তার মানে খুঁজে পাবে বলে আসে
শহরের শেষ ধাপে কবরসারির পাশাপাশি
এপিটাফগুলি তার অভিধা বাড়ায় সন্ধ্যাবেলা
নগ্ন অক্ষরের গায়ে মৃত বন্ধুদের হিম শ্বাসে।

১২

লোকে বলে ভুল, আর আমিও কি জানি না যে ভুল?
তবু তার মাঝখানে ডুবে আছি, যেভাবে মহিষ
নিজেকে নিহিত রাখে নিরুপায় জ্যৈষ্ঠের ডোবায়
বাতাস শুষেছে যার অবশ চোখের অলসতা।

১৩

আমি আছি, এই শুধু। আমার কি কথা ছিল কোনো?
যতদূর ফিরে চাই আদি থেকে উপান্ত অবধি
কথা নয়, বাঁচা দিয়ে সমূহ প্রবাহ পাব ব'লে
এই দুই অন্ধ চোখ ভিজিয়ে নিয়েছি অন্ধকারে।

১৪

দ্বাদশীর বুকভাঙা রুপালি মিথ্যার মধ্য দিয়ে
এই তো আমার পথ চলেছে এ রাত্রিবনময়
সবুজ ঘোড়ার ঝাঁপ, আচ্ছন্ন আয়ত উটগুলি
স্থির হয়ে পড়ে আছে গাছের আদলে দুই পাশে।

১৫

দিগন্ত ব্যথিত ক'রে পূর্ণিমা উপুড় হয়ে আছে
ছল ছল করে ওঠে মাঠে জমে-থাকা বৃষ্টিজল
বারুণী, আলোয় ওঠো প্রবাহতরল মুখ নিয়ে
তার পরে দুই জনে তুলে ফেলো জন্মের পাথর।

১৬

ওই স্নেহময় মুখে যখন রেখেছি দুই-হাত
তরুণ সবুজ পাতা স্মৃতিতে বুলায় মর্মরতা
বেঁচে যে ছিলাম তার বিরলতা জল হয়ে নামে
হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় পিছে পড়ে-থাকা সব মান।

১৭

এইসব যাওয়া আসা কিছু কষ্ট রেখে যায় শ্যামবিকাশের অন্ত পারে
কোথায় চলেছি আমি ?   পৃথিবী বা কতদূরে যাবে ?
আমারই নিজের হাতে নষ্ট করে দিয়েছি এ ঘর
হৃৎপিণ্ডে অন্ধকার ঢেলে এই দুই হাত বাড়িয়ে বলেছি : পান করো

১৮

বয়সের উপরে সে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণ বাহুতে
বাঁ-হাতে উড়িয়ে দেয় ঘর থেকে তুলে আনা খাঁচার মুনিয়া
ছাড়া পেয়ে চলে যায় বন্ধুবিচ্ছেদের মতো সটান রেখায়
স্মৃতির ঝলক লেগে পাথরের মুখ আরো কালো হতে থাকে।

১৯

পাহাড়ে বালির চরে একাকার হয়ে যাওয়া পাথরে বালিতে
কাকে নির্বাচন দেবে সেকথা বোঝার আর সামর্থ্য ছিল না
তাই সে কপিশ এই ব্যর্থতার চেয়ে আরো ব্যর্থতায় ভাঙা
আত্ম-ইতিহাস থেকে গড়ে তোলে শাপগ্রস্ত দিনের জড়োয়া।

২০

স্বপ্নের কটাহ থেকে ভোররাতে উঠে আসে প্রেমিক যুবারা
দেখে যে তাঁবুর পাশে ঘিরে আছে আশাবরী মাঘের কুয়াশা
ভাসমান শরীরের আনন্দ-উদ্ভিদ দিয়ে চেপে ধরে মাটি
আগুন লেগেছে চোখে, ভালোবাসা ছাড়া কিছু নেই মনে হয়

২১

তোমাদের মুখে আমি হাত রেখে বলিনি কখনো
'এখন কেমন আছো ? বেঁচে আছো নিজের নিয়মে ?'
শীতের পাহাড়গুলি আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল
তোমাদের মুখে আজ ছুঁতে চাই সমস্ত মানুষ।

২২

আর কোনো শব্দ নেই, দৃশ্যে ধুয়ে গেছে রাত্রিবেলা
নীলাভ রুপোলি শূন্য ভেদ ক'রে পরিত্রাণহীন
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আমরা চলেছি সারি সারি
চন্দ্রকিরণের নিচে, খড় নিয়ে, গোরুর গাড়িতে।

২৩

আঙুল, ধানের শিষ, তুমি আছো প্রেমে ও প্লাবনে
আমার কপালে আঁকো বেঁচে থাকা, চন্দন, আকাশ
বায়ুর ভিতরে স্নেহ মৃদু বয়ে যায় পাপহরা
এবং শূন্যের থেকে আচম্বিতে গ্রামের উত্থান।

২৪

নদী খুব নদী নয়, ভেজায় পায়ের মূল, পাতা
প্রেম তত প্রেম নয়, ঘিরে আছে সীমানা কেবল
শ্মশানও তেমন ধুনি সাধনার বিশালতা নয়
রাত্রি শুধু বীজময়, ভোর শুধু ভোরের বাগিচা।

২৫

অন্ধকারে নীরবতা দিগ্‌ব্যাপী মসৃণ গোলাপ
তোমার ধ্যানের পুঞ্জ উঠেছিল আকাশের দিকে
লণ্ঠন তুলিয়ে আসে গ্রামান্তের শববাহকেরা
আলায় গোলাপ আর স্তবের মুহূর্ত ফেটে যায়।

২৬

জীবন যখন ছিল হাতে ছুঁয়ে দেখিনি কখনো
আজ ঘুরে মরি শুধু সমতল পাহাড়ের চূড়া
শুনেছি বনের পাশে পড়ে আছে শ্যামারূপা গড়
মেলা নয় মধ্যরাতে পার হব জয়দেব, অজয়।

২৭

পুরোনো মন্দির থেকে হঠাৎ উড়াল দিলে ডানা
যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্মৃতিতলে সমস্ত কৈশোর
তোমার মুখের দিকে সেইভাবে নেমে আসে মুখ
অনাথ, আতুর, অন্ধ—তোমাকে পারে না ঠিক ছুঁতে।

২৮

এই চত্বরের পাশে শুকনো খোলস আছে পড়ে
তৃপ্ত পিচ্ছিলতা নিয়ে চলে গেছে সচ্ছল শরীর
যাবার রেখায় পথ, পথ চলে শহর অবধি
এই চত্বরের পাশে পড়ে আছে শীতের দুপুর।

২৯

বসতি ফুরিয়ে গেছে, ঘন হয়ে বসেছি কজন
আমাদের ঘিরে আছে ঘনতর দেড়শো মন্দির
কোনো সমাগম নেই, সবুজ হয়েছে মরা জল
আগল খোলার শব্দে শিবলিঙ্গে বাদুড়ের ছায়া।

৩০

এই উরু ধানখেতে শরীর প্রাসাদ হয়ে যায়
প্রতিটি মুহূর্ত যেন লেগে থাকে প্রাচীন স্ফটিক
সীমান্ত পেরিয়ে যেই পার হই প্রথম খিলান
ঘর থেকে ঘর আর হাজার দুয়ার যায় খুলে।

৩১

পদক্ষেপে পদক্ষেপে এক অক্ষৌহিণী বৃষ্টিরেখা
স্তব্ধ বসতির দিকে ধেয়ে আসে প্রান্তর পেরিয়ে
প্রস্তুত ছিল না রথ, চালবর্ম দূরে, পড়ে আছি
খোলা দশ দিগন্তের মাঝখানে·সিক্ত পরাভূত।

৩২

মজ্জায় মজ্জায় তার আলস্যমথিত অন্ধকারে
জেগে ওঠে দীর্ঘ শাল আজানুলম্বিত বটঝুরি
সন্ন্যাসী জ্বালায় চুল্লি দুঃসহ গহনে মন্ত্র পড়ে :
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

৩৩

শিকড়, ব্যথিত শিরা, মানুষের অতল উৎসার
এর ওর মুখে এত ভাঙা ছবি সাজিয়ে রেখেছ!
জানো না আমিও ঠিক সেইভাবে চেয়েছি তোমাকে
মাটিকে আঙুল দিয়ে খুঁড়ে ধরে যেভাবে এ বট।

৩৪

এখানেই ছিলে তুমি? এইখানে ছিলে একদিন?
ছুঁয়ে দেখি লাল মাটি, কান পেতে শুনি শালবন,
সমস্ত রাত্রির প্রেত সঙ্গে নিয়ে ঘুরি, আর দেখি
তোমার শরীর নেই, তোমার আত্মাও আজ ঢেকে গেছে ঘাসে।

৩৫

আমি কি মৃত্যুর চেয়ে ছোটো হয়ে ছিলাম সেদিন?
আমি কি সৃষ্টির দিকে দুয়ার রাখিনি খুলে কাল?
ছিল না কি শষ্পদল আঙুলে আঙুলে? তবে কেন
হীনতম অপব্যয়ে ফেলে রেখে গেছ এইখানে?

৩৬

এসো ভালোবাসো, এসো, সন্দেহ কোরো না, ভালোবাসো
মাটি ছুঁয়ে কথা বলো, হাতে হাত রাখো, চুপ করো
পলির প্রসাদে নাও মুছে নাও পাড়ের পাথর
দেখো তার কাছে এসে নুয়ে আছে আহত মানুষ।

৩৭

এই মেঘ আমাদের, মেঘের মণ্ডনে বসে আছি
এক মুহূর্তের তাপে কেন্দ্র ও পরিধি কাছাকাছি
যা ছিল যা হবে তার দুই মুখ কথা বলে এসে—
বয়স ? সে বেঁচে থাকে তোমার শরীর ভালোবেসে

৩৮

ওই কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ছুটে যায় হিম আর্তনাদ
মেহেদির বেড়া ভেঙে যুবতী জোয়ারে ঊর্ধ্বচারী
যেখানে শিরীষশাখা বসন্তে ফুটিয়েছিল ফুল—
মেয়েটি উন্মাদ, তবু মা ওকে মেরো না অন্ধ ঘরে।

৩৯

পাত্র তো সুন্দর, কিন্তু কানায় কানায় ভরা বিষ
দেখো, অভিভূত হও, ঠোঁটে তুলে নিয়ো না কখনো
ঝলক লেগেছে চোখে, দুপুরে পারদ, হল্‌কা ওঠে
চেতনা বধির ক'রে ভাসমান তরল আগুন।

৪০

উঁচু হয়ে জেগে আছে নষ্ট প্রতিভার মরা ডাল
আকণ্ঠ কলঙ্কে বুঝি দুঃখ উঠেছিল কত দূর।
আজ নেমে গেছে সব, ছিন্ন শাঁসগুলি মনে রাখো
দুপাশে মহুয়া, কিন্তু মাঝখানে সামাজিক সাঁকো।

৪১

ঝাঁপ দিয়ে উঠে আসে কয়েক রক্তিম বিন্দু জল।
আমার বুকের কাছে, নিশ্চিন্ত শকুন ডানা ঝাড়ে।
সবুজ, সবুজ হয়ে শুয়ে ছিল প্রাকৃত পৃথিবী
ভিতরে ছড়িয়ে আছে খুঁড়ে-নেওয়া হৃৎপিণ্ডগুলি।

৪২

আমার শরীরে কোনো গান নেই। কাঠুরেরা আসে
একে একে কেটে নেয় মরা ডাল গুঁড়ি ও শিকড়
তার পরে ফেলে রাখে মাঠের পশ্চিম পাশে, আর
দূরের লোকেরা এসে ধুলোপায়ে বেচাকেনা করে।

৪৩

সাঁকো তুলে নিয়ে গেছে তোমাদের দল বহুদিন
আমিও আমার ছায়া ভেঙে দিয়ে চলে গেছি দূরে
এখন স্রোতের কাছে দাঁড়িয়ে অঘোর মুখোমুখি
অতিকায় হাত মেলে, আমি নয়, আমার কঙ্কাল।

৪৪

দাও ডুবে যেতে দাও ওই পদ্মে, কোরকে, কোমলে
দাও চোখ ধুয়ে দাও ভোরের আভায়, জন্মভোর
শিরায় শিরায় বাঁধো, পাপড়িগুলি ঢেকে বলে যাও
ফিরে যাওয়া যাওয়া নয়, সেই আরো কাছাকাছি আসা।

৪৫

মনে পড়ে আমাদের কলস্বনীলিত সন্ধ্যাগুলি
বাতাসে ধাতুর ভার আকাশে ক্ষতের উজ্জ্বলতা
ডানা মেলে ঝেঁপে আসে অশরীরী ছন্দে কালো ঝাউ
করোটির মধ্যে তার শব্দ ওঠে আজও দিনরাত।

৪৬

কথা ব'লে বুঝি ভুল, লিখে বুঝি, হাত রেখে বুঝি
এ রকম নয় ঠিক, এ তো আমি চাইনি বোঝাতে।
কাগজের মুখ নিয়ে সভাশেষে ফিরে গেলে লোকে
মনে হয় ডেকে বলি : এইবার ঠিক হবে, এসো।

৪৭

এখন ভুলেও গেছে সেইসব ব্যথা দেওয়া নেওয়া
আছে তাই আছে এই থাকা-না-থাকার মাঝখানে
মাথায় সোনালি থাবা জেগে আছে, আর তার নিচে
ঘাড় পেতে দাঁড়িয়েছে খোলা মাঠে মন্থর মানুষ।

৪৮

চোখের ভিতরে ধুঁয়া, ভস্মে ভরে যায় দৃশ্যভূমি
পৃথিবী পাঁজর খুলে পড়ে আছে মাটির ফাটলে।
তুমি এসে হাত পাতো, হাত রাখো পাথরে ধুলায়
গাছ হয়ে যাবে সব গাছের শিরার মতো হবে।

৪৯

অবাধ নাচায় শূন্য জলের তরঙ্গ এই দাহ
ও তার ভিতরে আজ, তুমি ওর পাশে এসে বলো :
যতটুকু দেখে গেলে ততটুকু নয়, আরো আছে
ভালোবাসা থেমে আছে আমারও আমূল অন্ধকারে।

৫০

নিচু হয়ে এসেছিল যে মানুষ অপমানে, ঘাতে
ঝরে গিয়েছিল যার দিনগুলি প্রহরে উজানে
তারই কাছে এসে ওই পাঁজরে পালক রেখেছিলে
তোমার আঙুলে আমি ঈশ্বর দেখেছি কাল রাতে।

৫১

কেন কষ্ট পাও ? কেন ওই হাতে হাত ছুঁতে চাও ?
জলের লহরী যেন ভাস্কর্য ধরেছে বুকে এসে।
পুরোনো অভ্যাসবশে দাঁড়িয়ে রয়েছে নষ্ট মাথা
চন্দন পায়ের তলে, চোখের পাতায় তুলসী পাতা।

৫২

আজও কেন নিয়ে এলে ভ্রষ্ট এই অন্ধ মৃত্যুজপ
দুরূহ যুবারা যাকে ভালোবেসে প্রসিদ্ধ করেছে !
ধমনী শিথিল জলে ভরে দেয় ঘূর্ণমান তারা
হাজার স্লিপিং পিল মাথার ভিতরে আত্মহারা।

৫৩

ফুসফুস মৌচাকে রুদ্ধ, তাকাও চোখের দিকে স্থির
ভাবি যদি একবার বলো এ দ্যুলোক মধুময় !
বুভুক্ষু ঠোঁটের ভাঁজে ক্ষীণ নিমপাতা তবু বলে :
বোলো না প্রসন্নমুখে মৃত্যুর দক্ষিণে চলে যেতে ।

৫৪

আয়োডিন থেকে শুরু এ আদিম দীর্ঘ করিডর ।
ছায়ামুখে জালামুখে জীবাশ্মপ্রহৃত ভাঙামুখে
সারি সারি বসে আছে শালকিয়া হালতু বড়িশা
শাদা অ্যাপ্রনের গন্ধে ক্লোরোফর্ম খোলে রুদ্ধ ও, টি

৫৫

প্রগাঢ় অন্যায় কোনো ঘটে গেছে মনে হয় যেন
কিছু কি দেবার কথা কিছু কি করার কথা ছিল ?
থেমে-থাকা বৃষ্টিবিন্দু হাড় থেকে টলে পড়ে ঘাসে
ভেজা বিকেলের পাশে ডানা মুড়ে বসে আছে আলো ।

৫৬

ফোয়ারা শিখার মতো ধমনীতন্তুর পাকে পাকে
ছড়িয়ে দিয়েছে আজ বর্বর দাহের শত জালা
এই নাচ থেকে তার মুক্তি চাই ব'লে ছুটে যায়
শহরের মাঝ থেকে খুঁড়ে তোলে টন টন নুড়ি ।

৫৭

মাথায় হাতুড়ি মারে, সূর্যাস্তরেখায় কাটে দিক
পিঠের বল্লম তোলে, অন্ধকার লুটায় পাথরে
গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁপে, দূর থেকে ঘিরে আসে ঝড়
জামের রক্তের রঙে রাত্রির আকাশে চাপা রাগ।

৫৮

কিছু-না-পারার এই ক্লীব খোলসের বন্দী ভ্রূণ
গোপন রাত্রির স্তূপে পড়ে আছে পরিত্যাগে রাগে
হাওয়ায় জাগানো মুখে অবিরাম জ্বলে থাকে ক্ষার
সহজ হয়নি তার যে-কোনো সহজ অধিকার।

৫৯

সে তো নিজে অন্ধ নয়, তাকে অন্ধ বানায় সমাজ।
তারপরে বলে, যাও, চাও ভিক্ষা, দয়া চাও পথে—
আর ততক্ষণে তার চিৎকৃত ভিক্ষায় থুথু ছুঁড়ে
একমাত্র জ্ঞান আজ পেতে চায় শূন্যের বিজ্ঞান।

৬০

তুমি কি কবিতা পড়ো ?   তুমি কি আমার কথা বোঝো ?
ঘরের ভিতরে তুমি ?   বাইরে একা বসে আছে রকে ?
কঠিন লেগেছে বড়ো ?   চেয়েছিলে আরো সোজাসুজি ?
আমি যে তোমাকে পড়ি, আমি যে তোমার কথা বুঝি।

৬১

প্রতি মুহূর্তের ধান আসক্ত মুঠোয় রাখি ধরে
তার পরে যায় যদি অবাধ সন্ন্যাসে ঝরে যায়
এই মাঠে আসে যারা সকলেই বোঝে একদিন
এক মুহূর্তের মুখ আরেক মুহূর্তে সত্য নয়।

৬২

খুব অল্প ভালো লাগে এইসব বহু বিচ্ছুরণ
খান খান হতে থাকা রঙকরা সামাজিকতায়।
মাটির ভিতরে শস্য নিভৃত আশ্বাস নিয়ে বাড়ে
বুকে ঔধারের ভারে নিশ্চল হয়েছি একেবারে।

৬৩

মাটি খুব শান্ত, শুধু খনির ভিতরে দাবদাহ
হঠাৎ বিস্ফারে তার ফেটে গেছে পাথরের চাড়।
নিঃসাড় ধুলায় দাও উড়িয়ে সে লেখার অক্ষর
যে লেখায় জয় নেই, লাভা নেই, অভিশাপও নেই।

৬৪

ঘিরে ধরে পাকে পাকে, মুহূর্তে মুহূর্ত ছেড়ে যাই
জলপাতালের চিহ্ন চরের উপরে মুখে ভাসে
তাঁবু হয়ে নেমে আসে সূর্যপ্রতিভার রেখাগুলি
স্তব্ধ প্রসারিত-মূল এ আমার আলস্যপুরাণ।